বাণ্ডারী

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
প্রবোধকুমার সান্যাল
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—পরিবেশক—
ঋতেন শীল
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীহেমেন্দ্র কুমার শীল।
শ্রীরীতেন্দ্র কুমার শীল।
'পর্ণ কুটীর'
৬, কামারপাড়া লেন,
বরাহনগর।

প্রকাশ : ১৮ জুলাই ১৯৬২।

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :
সত্য চক্রবর্তী

মুদ্রণ করেছেন :
গোপীনাথ চক্রবর্তী
'অবলা প্রেস'
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৬

বাগ্দেবী

বাংলার ছ'জন খ্যাতনামা কথাশিল্পী এই উপন্যাসখানি লিখেছেন। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে এই গল্পটি সগৌরবে প্রচারিত হয়। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্যে আমরা সেই উপন্যাসটি পরিবর্ধিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করলাম।

প্রকাশক

মেডিকেল কলেজ থেকে বার হ'য়েই কমলাক্ষ একটা চাকরী পেয়েছিল, খুব ঘোরাল কিছু না হ'লেও বেকার সমস্যার দিনে তাতে অনেকের জিভে জল আসবার কথা কেননা মাসে থোক্ পাঁচশ টাকা—পাঁচশ টাকাই। এমন কি ইন্‌ক্যাম ট্যাক্‌স পর্যন্ত নেই। তা ছাড়া প্রাক্‌টিসের আয়ও অনির্দিষ্ট—সুতরাং অপরিসীম সম্ভাবনা তো আছেই।

কমলাক্ষ চাকরী প্রত্যাখ্যান ক'রে—করলে একটা ডিস্পেন্সারী, স্বাধীন ব্যবসা করবে—তার ওপর দাসত্বের ছাপ থাকবে না।

হিতৈষী-বান্ধবের অভাব ছিল না। তারা বেশ স্পষ্ট ক'রেই তাকে বুঝিয়েছিল যে, দাসত্ব যতই খারাপ হোক লোকের দোরে দোরে ঘুরে ফ্যা ফ্যা ক'রে বেড়ানর দীনতার চেয়ে সেটা ভাল। ব্যবসায় শেষে স্বাধীনতা থাকবে শুধু উপবাস করবার। এই সব অদৃষ্টবাদীদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে কমলাক্ষ তাল ঠুকে ব'ল্লে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।"

বন্ধুদের কথায় কোন উপকার না হলেও কমলাক্ষ তার এ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করতে পারত না—অর্থাভাবে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে তার বাপ পরম সুবিবেচকের মত মারা গেলেন। তার বাবা অসঞ্চয়ী ছিলেন, তাঁর পক্ষে টাকা তুলে দেওয়া সহজ হ'ত না; তিনি মারা যাওয়ায় বীমা কোম্পানী মারফত তাঁর একমাত্র ওয়ারিস কমলাক্ষ পেয়ে গেল নগদ কয়েক হাজার টাকা।

'বাণিজ্যবাসিনী লক্ষ্মী' যেন তাঁকে হাতে তুলে এ টাকাটা দিয়ে তাঁর কনকাঙ্গুলি দিয়ে কমলাক্ষের পথ নির্দেশ করলেন। এরপর তাকে ঠেকিয়ে রাখে কে?

তাই পিতার মৃত্যুতে কমলাক্ষ যথানিয়মে যথোচিত শোক বোধ

করলেও এই সুযোগ ঘটায় সম্পূর্ণ বিধি-বহির্ভূত উল্লাস অনুভব না করে পারলে না।

মূলধন জুটে গেল, হালফিল অন্নচিন্তা রইলো না। কাজেই ডিস্পেন্সারী হ'লই। মহা উৎসাহে কমলাক্ষ সেখানে অহোরাত্র ব'সে —পড়তে লাগলো খবরের কাগজ, মেডিক্যাল জার্ণাল আর বিলাতী নানা ওষুধের বস্তা বস্তা তথা কথিত লিটারেচর অর্থাৎ সাদা বাংলায় বিজ্ঞাপন। সে পড়ে আর মাঝে মাঝে পথ পানে চায়, রোগী ও খরিদ্দারের ব্যর্থ আশা ও প্রতীক্ষায়।

বছর দুই পরে কমলাক্ষের মনের সহরতলীর অঞ্চলের দূর সীমানায় এই অনুভূতিটা একটা ধাক্কা মারতে লাগল যে তার এই ব্যবসায়েও হয়তো লক্ষ্মী বাস করেন, কিন্তু অতি নিরালায় ওষুধের আলমারীর ভিতর বন্ধ হয়ে। সেখান থেকে টপকে এসে কমলাক্ষের পকেটে বা তার সিন্দুকে প্রবেশ করবার তাঁর বেশী গরজ নেই।

লক্ষ্মীকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর চিরদিনের অভ্যাসই এই যে, তাঁকে সরগোল করে টেনে বের করতে হয়। তবে কারবারের যে সব আধুনিক প্রক্রিয়া আছে—যাকে এক কথায় বলে ব্যবসার প্যাঁচ—মেডিক্যাল কলেজের পাঠ্যতালিকা অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কমলাক্ষের সেগুলি আয়ত্ত করবার সুযোগ হয়নি। লোক মুখে সে এ-সবের খবর কিছু কিছু পেয়েছে। কিন্তু ডাক্তারী অনারেবল প্রফেসন, তাকে সে এসব খেলো প্যাঁচের ভিতর ফেলে অপমান করবার ছেলে কমলাক্ষ নয়। তাই সে ডাক্তারখানায় শুধু গট হয়ে বসে থেকেই স্বপ্ন দেখতে লাগলো যে তার অস্তিত্বের টান সইতে না পেরে রোগী খরিদ্দাররূপে পদ্মাসনা হুড় হুড় করে তার পকেটের ভিতর ধাওয়া করবেন।

এই প্রতিজ্ঞায় সে অটল রইলো, কেন না হুড়োমুড়ি করে জোগাড়ের জোরে ব্যবসা জাঁকান যে চরিত্র ও শিক্ষায় হয়, তা তার ভিতর মোটেই ছিল না।

প্রতিজ্ঞা ঠিক রইলো, কিন্তু মনের তলায় অনেকবার তার অনেক দুরন্ত কামনা হ'য়েছে। বিশেষ তরে তার আসবার পথে ডাক্তারখানার রশিখানেক দূরে যে একখানা প্রকাণ্ড বাড়ী আছে তার দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক দুরাকাঙ্ক্ষা এবং দুরাশা তার মনের ভিতর ছুটোছুটি করছে। বাড়ীখানা কলকাতার বিখ্যাত ক্রোড়পতি ধনেশ্বর তলাপাত্রের। এমন দিন যায় না যেদিন পথে আসতে আসতে কমলাক্ষ এ বাড়ীর সামনে স্যার নীলাম্বর গড়গড়ি, কি সাধনচন্দ্র বরাট, কি স্যার ব্যারি বারবার প্রভৃতি বিখ্যাত ডাক্তারের এক বা একাধিক মোটর সে ও বাড়ীতে দাঁড়ান না দেখে। বাড়ীখানা যেন একটা প্রাইভেট হাসপাতাল, ডাক্তারের স্বর্গ—কমলাক্ষের মনে হয় রোগ বোধ হয় সেখানে বারোমাস লেগেই আছে—আর যেমন তেমন রোগ নয়। গড়গড়ি বরাট ও বারবার ছাড়া যার চিকিৎসা হয় না এমন রোগ। ওঃ এ বাড়ীতে যদি পারিবারিক চিকিৎসক হতে পারতো সে। নিজের ওষুধগুলোও যদি তার দোকান থেকে নিতো। না নেবার কোনও হেতু নেই; কেননা বলতে গেলে তার দোকান একেবারে দোরগোড়ায়। —একবার হুট করে বাড়ীতে ঢুকে তলাপাত্র মহাশয়ের কাছে কথাটা বললে কেমন হয়?

একদিন মরিয়া হয়ে সে গিয়েও ছিল দেখা করবে বলে কিন্তু বেগে চলতে চলতে ফটকে দরোয়ানকে দেখে হঠাৎ সে অনুভব করলে যে শিরদাঁড়ার ভিতরকার যেসব মোটর গ্যানগ্লিন সমস্ত মাংসপেশী চালায় সেগুলি একেবারে একযোগে হরতাল করে বসে আছে।

তলাপাত্রের বাড়ী থেকে দিন রাতে দশখানা দামী মোটর অন্তত পাঁচশোবার তার দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করে। কমলাক্ষ ভাবে এর কতকগুলোর ভিতর—চাই কি সবগুলির ভিতরেই হয়তো সেই সব দুরন্ত রোগগ্রস্ত লোকগুলি আছে। এমনও তো হতে পারে যে ঠিক তার ডাক্তারখানার সামনে এসে তাদের একজনের নাড়ী ছাড়বার

মত হতে পারে—তখন হাতের গোড়ায় তাকেই পেয়ে গাড়ী থামিয়ে কমলাক্ষকে এরা ডেকে নেবে দেখাতে। হয় না একদিন এমন ?

বধিরা কমলার কানে কথাটা গেল কি ? তাঁর মর্মরে গড়া হৃদয়ের এক কোন হঠাৎ গলে মাখন হয়ে গেল কি ? নইলে নক তার দোকানের সামনে তলাপাত্রের প্রকাণ্ড গাড়ীর ঘাড়ের উপর অতবড় লরীখানা এসে পড়লো কেন ?

কমলাক্ষ পড়ছিল একটা নতুন বিলাতী ওষুধের বিজ্ঞাপন। মানুষের শরীরের এনডুরেন্স গ্লাণ্ডসএর উপর একেবারে প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলে এই ওষুধ প্রণালীতে স্নায়ুমণ্ডলীর প্রত্যেকটি গ্যানজিলিয়ান উত্তেজিত হয়ে অসম্ভব সব উপকার সাধন করতে পারে—নিবিষ্ট মনে সে কথা পড়তে পড়তে হঠাৎ সে শুনতে পেলো যে আকাশের সব গ্রহগুলো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়লো, আর সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যসেনা স্বর্গ জয় করে হুঙ্কার ধ্বনি করলে। এক মূহূর্ত আগে রাস্তা প্রায় জনশূন্য ছিল। কমলাক্ষ মুখ তুলে চাইতে না চাইতে হঠাৎ নিশ্চয় মাটি ফুঁড়ে সেখানে তিন হাজার লোক এসে পড়লো, আব তাদের সমবেত কণ্ঠে এমন একটা কলধ্বনি করে উঠলো—যেন ইউরোপের মহাসমর।

কমলাক্ষ তড়াক করে উঠে এগিয়ে গেল। খুব ব্যস্ত হয়েই সে গেল, কিন্তু, মনের ভিতর একটা অদম্য পুলকের শিহরণ বয়ে গেল তার। এতখানি হ'ল আর এমন একটা জখম হয়নি কি যাতে তখনি ডাক্তারের আশু চিকিৎসার দরকার হবে ?

ডাক্তার দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিলে, কেউ আগ বাড়িয়ে তাকে নিতে এলো। ভিড় ভেদ করে গিয়ে সে দেখলে—নাঃ কিছুই হয়নি। তলাপাত্রের এত ভারি ও শক্ত গাড়িখানার কিছুই করতে পারেনি মোটর লরী। দুটো মাডগার্ড ভ্রুকুটি করে রয়েছে আর দুটো টায়ার বোধহয় হাসতে হাসতে ফেটে গেছে, ভেঙেছে একটা ইলেকট্রিক

পোষ্ট। গাড়ীর ভিতর লোকজনের কিছু হয়েছে বলে মনে হল না। কমলাক্ষ একটু হতাশ হ'ল কিন্তু—

হ্যাঁ, হয়েছে বই কি। ওই যে মেয়েটি ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে একেবারে ঢলে পড়েছে। ডাক্তার চটপট গাড়ীর দরজা খুলে দেখতে পেলো, ধাক্কা খেয়ে মেয়েটির কলার বোণ ভাঙা তো দেখা যাচ্ছেই বুঝি বা আর কিছু হয়েছে।

তখন কমলাক্ষের আর কিছু মনে হ'ল না—সে ডাক্তার, আহত চিকিৎসাথী তার সামনে। তার সমস্ত শরীর ও মনের ডাক্তার অংশ বিচ্ছিন্ন করে যেন অদৃশ্য হাতে তার সুইচ টিপে দিলে, সেই সুগঠিত যন্ত্র অমনি কাজে লেগে গেল।

শিক্ষিত হস্তে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাবধানে মিয়েটিকে বের করে আর একজন লোকের সাহায্যে কমলাক্ষ তার ডিস্পেনসারী সংলগ্ন অপারেশন টেবিলে শুইয়ে দিলে। চটপট পরীক্ষা শেষ করে সে মেয়েটিকে একটা ইনজেকশন দিয়ে সুনিপুণ ভাবে ব্যাণ্ডেজ করে শুইয়ে রাখলে। তারপর আবার নাড়ী ও হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সে সিগারেট ধরালো।

এতক্ষণে তার জ্ঞান হ'ল যে এই অবসরে সমস্ত রাস্তার লোক তার ডাক্তারখানার বাইরে ও ভিতরে ভিড় করে এসেছে, তলাপাত্রের বাড়ীর দারোয়ানেরা তাদের সরাবার চেষ্টা করছে, পুলিশের লাল পাগড়ী সেখানে প্রকট হয়েছে। এতক্ষণ সে এসব টের পায়নি।

লোকগুলিকে ভিড় করতে বারণ করে সে আবার রোগিনীর কাছে গিয়ে মনোজ্ঞ স্বপ্ন রচনা করতে বসলো। এরপর তলাপাত্রের ওই বিরাট প্রাইভেট হাসপাতালে তার প্রবেশ অনিবার্য। কৃতজ্ঞ তলাপাত্র এবার—এমন সময় মনের ভিতর একটা প্রচণ্ড তাণ্ডব লেগে গেল। হঠাৎ রোগিনী মুখের দিকে চাইতেই তার চিন্তাস্রোত বন্ধ হয়ে গেল, রক্তের স্রোতও যেন স্তব্ধ হয়ে গেল—এতক্ষণে তার খেয়াল

হ'ল কি অপূর্ব রূপের ডালি এই মেয়েটি। তারপর এই কথাটাই উল্টে পাল্টে তার মনে ধাক্কা দিতে লাগলো নানারূপে—সৃষ্টি করতে লাগলো নতুন নতুন স্বপ্নের ধারা।

লক্ষ্মী এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। এবারে আর সৌভাগ্য ঠেকান যাবে না। লক্ষ্মী তো শুধু টাকাই বিলোন না, জগতের সকল স্ত্রী নারীর ভিতর যার কণা ছড়িয়ে থাকে সেও তো তাঁরই জিম্মা। তাঁর দয়া যখন হ'য়েছে সিন্দুকের চাবি যখন একবার খুলেছেন তিনি, তখন কি শুধু টাকা ছেড়েই থামবেন? এই মূর্তিমতী শ্রী—চাই কি—

দেখতে দেখতে তিনপ্রস্থে সাতমন তলাপাত্র সবংশে এসে কমলাক্ষের ডিস্পেনসারীর দোর, জানালা এবং মেঝে পদধূলিপূত করলেন। কমলাক্ষকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সবংশে তিন তলাপাত্র ছুটে গেলেন রোগিনীর দিকে, প্রত্যেকে নাড়ী ও হাড়গোড় পরীক্ষা করার আগ্রহ প্রকাশ ক'রে।

কমলাক্ষ তাদের পথ আগলে শান্তভাবে বললে—'দয়া করে ওকে ডিস্টার্ব করবেন না। ওঁর ফ্যাকচারটা সাধারণ, কিন্তু শক্ ভয়ানক হয়েছে। সম্পূর্ণ রেষ্ট দরকার।

বড় তলাপাত্র—ওরফে ধনেশ্বর তীব্রস্বরে বললেন, 'তুমি কে হে?'

কমলাক্ষ বললে, 'আমি ডাক্তার।'

মেজ তলাপাত্র—'হুঁ—হুঁ—'বলে মুখ ফেরালে।

ছোট তলাপাত্র বললে, 'মাথা কিনেছ।'

বড় তলাপাত্র বললেন—হু? ডাক্তার আসছে, টেলিফোন করে এসেছি। ডাক্তার বারবার আর বরাট রওনা হয়েছেন, গড়গড়িও এলেন বলে। যা ব্যবস্থা করতে হয় তাঁরা করবেন। ওহে, মণিকে তুলে নিয়ে চল।

কমলাক্ষ নিতান্ত মুখচোরা; সামান্য লোকের মুখ চেয়েও কথা কইতে পারে না, ক্রোড়পতির তো কথাই নেই। কিন্তু কথা কইল—কমলাক্ষ নয়, ভিতরকার ডাক্তার। সে অম্লান বদনে তলাপাত্র-ত্রয়ের মুখের

ওপর বল্লে, কিছুতেই নয়। আর অন্ততঃ আধঘণ্টা না দেখে ওঁকে আমি নিতে বা দিতে পারি না—'আর গাড়ীতে তো নয়ই ?'

'মেজ তলাপাত্র বল্লেন—তুমি ওকে নিতে দেবার বা না দেবার মালিক নও।'

'মাপ করবেন— আমি ডাক্তার—'

'ঢর ঢের ডাক্তার দেখেছি'—আরম্ভ করলে ছোট তলাপাত্র।

'তা বেশ অন্য ডাক্তার যিনি আছেন তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন, তাঁর নিজের দায়িত্বে যদি তিনি ওঁকে নিয়ে যান যাবেন। আমি সে দায়িত্ব নিতে পারবো না। এখন নিলে, হয়তো বাড়ীতে নিতেও পারবেন না—হার্টফেল হওয়া অসম্ভব নয় !

তিনটি তলাপাত্রের ভিতর তিন খণ্ড উদ্যত রোষ গ্যাসভরা বেলুনের মত ফুলে উঠেছিল, কমলাক্ষের শেষ কথায় তা একেবারে চুপসে গেল।

কেন না মেয়েটি তিন তলাপাত্রের মধ্যে একমাত্র মেয়ে, দিও তার সাক্ষাৎ পিতা ছোট তলাপাত্র। কাজেই সগোষ্ঠী তলাপাত্র সন্ত্রস্ত হয়ে সেই দোকানে চেপে বসে গেলেন।

দেখতে দেখতে ঘর বোঝাই হয়ে গেল রাজের বড় বড় ডাক্তারে। তারা কেউ কমলাক্ষের কাজে খুঁত ধরলেন, কেউ শুধু মুখ ভার করলেন, কেউ বললেন. এখন এক্সরে করতে হবে, এটা ওটা ইন্‌জেকসন দিতে হবে আরো কত কিছু করতে হবে। শেষে অনেক আলোচনার পর স্থির হল যে এখন কিছুই করবার নেই। সর্বসম্মতিক্রমে ঘণ্টা-খানেক গবেষণার পর ষ্ট্রেচারে করে মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হল।

আর কমলাক্ষকে পায় কে ? লক্ষ্মীর প্রসাদে পথ তার খোলসা, পুষ্পক রথও হাজির। সে হাওয়ায় চলতে লাগল।

* * *

দিনের পর দিন গেল। তলাপাত্রের ঘরে দলে দলে ডাক্তার আসতে লাগলো রোজ—কমলাক্ষের ডাক পড়লো না।

ওষুধ এল ঝুড়ি ঝুড়ি, কমলাক্ষের দোকান থেকে নয়।

এক্সরে করা হল, দেখা গেল কমলাক্ষ খুব নিপুণভাবেই ব্যাণ্ডেজ করেছে, চমৎকার জোড়া লেগেছে। মোট কথা, কমলাক্ষের আশু চিকিৎসায়ই যা করবার করা হয়েছে, এখন যা কিছু হচ্ছে সে শুধু বাড়াবাড়ি তবু কমলাক্ষকে ডাকবার কথা মনেও পড়লো না কারও।

আশার স্বর্গ থেকে ধপ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে কমলাক্ষের হল বড় রাগ। সে ব্যাণ্ডেজ ও ওষুধের দাম ও ফিসের একটা বিল করে পাঠিয়ে দিলে।

সে-বাড়ীর সরকার এসে ওষুধের দামটা দিল। ফিসের কথায় বললে—আপনাকে তো কল দেওয়া হয়নি, ফিস্ কিসের ?

কমলাক্ষের এত আশা উড়ে গেল।

বড় আশায় নিরায় হয়েই কমলাক্ষ বললে—'হায় !' বুক ভেঙে গেল তার। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে তার প্রাক্‌টিস বা সমৃদ্ধির স্বপ্নের কথা চুলোয় গেল খুব বেশী করে সে ভাবছিল সেই অপূর্ব রূপরাশির কথা যা' তার মনের আকাশে বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়ে এমনি করে অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

গভীর হতাশায় ডুবে কমলাক্ষ ভাবলে এখানে আর নয়। ডাক্তারখানা বেচে দিয়ে যাবে সে দূরে—অতি দূরে—

এমন সময় একজন তাকে একখানা চিঠি ও একটা মোড়ক দিয়ে গেল। চিঠি লিখেছে মণি

ডাক্তারবাবু,

আপনার চিকিৎসায় আমার প্রাণরক্ষা হয়েছে হাড়টা বেদাগ

হয়ে জোড়া লেগেছে। আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সামান্য নিদর্শন পাঠালাম ? দয়া করে গ্রহণ করবেন।

কৃতজ্ঞ
মণিমালা তলাপাত্র

মোড়কে ছিল একটা দামী হাত ঘড়ি।

*　　*　　*

এ রকম একটা দামী হাতঘড়ি মণিমালা তলাপাত্রের মত মেয়ের কাছ থেকে উপহার পেয়ে যে কোন লোক ধন্য হতে পারত। কৃতজ্ঞতার এমন-নিদর্শন, উপকারের এমন পুরস্কার পেয়ে খুশী হবারই কথা। কমলাক্ষ যে খুশী হয়নি তা নয়! ওই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে তার মন গোড়ায় আনন্দে নেচে উঠেছিল, কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণিক। খানিক বাদে ওই হাতঘড়িটিকে কেন্দ্র করে যে ভাবনার সমুদ্র উথলে উঠল তার মনে, তাতে থই পাওয়াই তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

ভাবনার কারণ অবশ্য যথেষ্ট ছিল। প্রথম হল হাত-ঘড়িটি দামী বটে কিন্তু সেটি পুরুষদের নয়, মেয়েদের ব্যবহার করবার, সূক্ষ্ম ও নিতান্ত সৌখীন জিনিস। এমন হাতঘড়ি তাকে পাঠাবার কি মানে হতে পারে ? (মণিমালা তাকে পরিহাস নিশ্চয়ই করেনি, এ ঘড়ি পাঠিয়ে।) সে কি তাহলে তার নিজের হাতঘড়িটা তাকে উপহার দিয়ে পাঠিয়েছে। এই চিন্তায় আত্মপ্রসাদের যতখানি সুযোগই থাক ব্যাপারটা যে একটু বিসদৃশ একথা অস্বীকার করা যায় না। একদিনের আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাদের মধ্যে ডাক্তার ও রোগীর ক্ষণিক সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে মাত্র। তার জন্যে মণিমালা যত কৃতজ্ঞতা বোধ করুক এভাবে মাত্রাজ্ঞান হারান ঠিক স্বাভাবিক নয়। ইচ্ছে করলে অনায়াসে সে একটা হাতঘড়ি তাকে কিনে পাঠাতে পারত।

তার বদলে নিজের হাতঘড়ি খুলে পাঠান কৃতজ্ঞতার একটু বাড়াবাড়ি নয় কি।

দ্বিতীয়ঃ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসাবে এটিকে মেনে নিলেও একটা মস্ত গোল মাঝখানে থেকে যায়। যে দুর্ঘটনায় তাদের পরিচয় তারপর অনেক মাস কেটে গেছে। এতদিন বাদে হঠাৎ এ উপহার পাঠাবার উৎসাহ কেন? কৃতজ্ঞ বোধ করলে এ উপহার তো মণিমালার অনেক আগেই পাঠানো উচিত ছিল। এতদিন পরে এটি পাঠাবার জন্য অপেক্ষা করবার অর্থ কি? তার কৃতজ্ঞতার বোধ কি এতদিন সুপ্ত ছিল? হঠাৎ এতকাল পরে তা উথলে উঠল কিসের প্রেরণায়। না সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে। ভেবে চিন্তে কোন দিক দিয়ে এ ব্যাপারের কোন কিনারা কমলাক্ষ করতে পারলো না।

কিনারা করতে না পেরে অন্য পাঁচজনের মত যদি সে ব্যাপারটা মন থেকে মুছে ফেলে দিতে পারত তাহলে তার হয়ত শান্তি মিলত কিন্তু আমাদের এ কাহিনী আর অগ্রসর হত না।

কিন্তু আমাদের কাহিনীর ভাগ্য ভাল কমলাক্ষ ওইখানেই থেমেরইল না। সে তাই নিয়ে আরো ভাবতে লাগল এবং একদিন হঠাৎ ভাবনা পরিত্যাগ করে একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। তলা পাত্রদের বাড়ীতে সে গেল মণিমালাকে ঘড়িটা ফিরিয়ে দেবার জন্য।

এ সঙ্কল্প করবার আগে তাকে অবশ্য দ্বিধায় দ্বন্দ্বে অনেকদিন কাটাতে হয়েছে। ঘড়িটা ফেরৎ দেওয়ার কথা ভাবা আর তা কাজে পরিণত করার মধ্যে কতখানি দুস্তর ব্যবধান তা সে ভাল করেই বুঝেছে। ঘড়ি ফেরৎ দেওয়ার এই সঙ্কল্পের মধ্যে শুধু যে তার ডাক্তারী অভিমান নেই, তার পেছনে প্রচ্ছন্ন ভাবে মণিমালার সঙ্গে একটা যোগ সূত্র স্থাপনের চেষ্টা যে আছে তাও সে জানে।

তবু একদিন শরতের সকালবেলা মেঘ মোছা আকাশের সোনালী বাঁকা রোদে যখন তার রোগী ও খরিদ্দারহীন ডিস্পেন্সারীর ওষুধের

শিশি ভরা আলমারীর কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে তার চোখে মাইনাস থ্রী চশমার কাঁচে এসে লাগল, তখন হঠাৎ তার মনে হল এমন সুন্দর সকালে পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। সমস্ত বন্ধ দরজা অনায়াসে খুলে ফেলা যায়, সমস্ত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর আজ অক্লেশে পার হয়ে যাওয়া যায়।

তার সবচেয়ে ভালো পোষাকটা পরেই সে বেরিয়ে ছিল তার উপর আরেকটা দারুণ অপব্যয় সে করে বসল, দুপা যাবার জন্য তাদের রাস্তার মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি নিলো। যে বাড়ীতে দিনরাত দামী মোটরের গাদি লেগে থাকে সেখানে একটা ট্যাক্সি চড়ে গিয়ে সম্ভ্রম আদায় করবে এমন কথা ভাববার মত মূর্খ অবশ্য সে নয়। এ ট্যাক্সি নেওয়া শুধু দেউড়ির দারোয়ানের খাতিরে। পদাতিকের রথারূঢ়ের মর্যাদা তার কাছে একটু বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

পোষাক আর ট্যাক্সির দরুণই হোক, অথবা শরতের সোনালী রোদ ভোজপুরীর হৃদয়ে ভাবান্তর এনেছিল বলেই হোক, দেউড়ির দারোয়ান আজ ভ্রূকুটির বদলে কমলাক্ষকে সেলাম করে দাঁড়াল। এরকম সেলাম যেন আজীবন পেয়ে আসছে এমন একটা ভাব দেখিয়ে কমলাক্ষ এগিয়ে গেল তলাপাত্রের ড্রইংরুমের দিকে।

কিন্তু ড্রইংরুমে ঢুকেই বাধল প্রথম। এবার সে কি করবে কার্ড পাঠিয়ে সোজাসুজি মণিমালার সঙ্গেই দেখা করতে চাইবে, সেটা কতদূর শোভন বা সঙ্গত হবে সে বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এ সন্দেহ গোড়া থেকেই ছিল বলেই এতদিন সে সাহস করে এগিয়ে আসতে পারেনি। আজ সকালে সোনালী রোদের আভায় এ সন্দেহ খানিকক্ষণের জন্য উবে গেল, কিন্তু এই সুসজ্জিত সুশোভন অথচ বিরাট ড্রইংরুমের স্তিমিত আলোয় সে সন্দেহ আবার ঘন হয়ে এল গাঢ় কুয়াসার মত।

এভাবে কার্ড পাঠিয়ে দেখা করতে চাওয়া শুধু অশোভন ও

অসঙ্গত নয়, হয়তো তার পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হতে পারে! অপমানিত হয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাও একেবারে সুদূর নয়। কিন্তু তবু একবার এগিয়ে এসে ফিরে পিছিয়ে যাওয়া আর চলবে না। এবং মণিমালার বদলে বাড়ীর কর্তাদের কাউকে ডাকিয়ে ঘড়ি ফেরৎ দেওয়ার মানেই হয় না। তা হলে সে তো ডাকেই ফেরৎ পাঠাতে পারত মনের মত একটি চিঠি লিখে। না, সে মণিমালারই সাক্ষাত উপস্থিত চায়। তার জন্যে নিজের সম্মান বিপন্ন করতে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সময় বয়ে চলেছে ঘড়ির কাঁটার পদধ্বনিতে। বেয়ারা উৎসুক ভাবে সামনে দাঁড়ায়ে। কি জানি ড্রইংরুমে তখন অন্য লোকজন কেউ নেই নইলে এভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হত। না আর দেরী নয়।

কমলাক্ষ মন স্থির করে ফেলে কার্ডের পেছনে মণিমালার নাম লিখে তাকে দেখা করবার জন্যে দু'লাইন বিনীত অনুরোধও জুড়ে দিল। বেয়ারাকে কার্ডটা দিয়ে মণিমালা তলাপাত্রের নামটা উচ্চারণ করবার সময় তার গলাটা বুঝি একটু কাঁপল কিন্তু সেটুকু বোধ হয় ক্ষমা করা যায়।

বেয়ারা চলে যাওয়ার পর প্রশস্ত ড্রইংরুমের অত্যন্ত সৌখীন একটি সোফায় বসে আজ পাঁচ দিন ধরে নিজের মনে যে মহলা দিয়ে এসেছে তাই কমলাক্ষ আবার নতুন করে দেওয়া শুরু করলে। সত্যিই যদি মণিমালা এ অনুরোধ রাখতে আসে তাহলে কি সে করবে? কেমন করে এই ঘড়ি ফেরৎ দেওয়াটাকে দানের অমর্যাদার আভাস থেকে বাঁচিয়ে একটা উর্ধ্বস্তরে নিয়ে যাবে।

মণিমালা প্রথমেই এসে একটু অবাক হবে নিশ্চয়। কার্ডে নাম থাকা সত্বেও হয়ত চিনতে সে না পারে, কিম্বা চিনেও না চেনবার ভাণ সে করতে পারে। অন্ততঃ অত্যন্ত সংযতভাবে এসে দাঁড়িয়ে ঈষৎ

গম্ভীর মুখে কমলাক্ষই প্রথম কথা বলবার জন্যে যে অপেক্ষা করবে এটা নিশ্চিত। কমলাক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে সাধারণ সৌজন্যের ধারা অনুসারেই বলবে,—আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম, না এসে উপায় ছিল না।

মণিমালা হয়ত তবুও কোন কথা বলবে না, ঈষৎ কৌতূহল ভরে তার দিকে তাকিয়ে পরের কথার জন্য অপেক্ষা করবে।

না, আর বেশী ভূমিকা কমলাক্ষ করবে না। পকেট থেকে কেস সমেত হাত ঘড়িটা বার করবে এবার। তারপর কেসটা খুলে ধরে বলবে—ডাক্তার হিসাবে আপনার সামান্য যে উপকার করেছি তার বিনিময়ে এমন পুরস্কার আমার আশাতীত।

উহুঃ, অত ঘোরালো করে বলা প্রথমেই হয়ে উঠবে না, এ ভাষা নয়। সে বরং তার বদলে বলবে,—দেখুন আপনার দেওয়া এ উপহার পেয়ে সত্যি আমি অত্যন্ত বাধিত কিন্তু তবু এ উপহার নিতে পারছি না, আমায় মাপ করবেন!

মণিমালার সুন্দর মুখে একটু ভ্রূকুটি ফুটে উঠবে কি! হয়ত উঠবে। তবু কমলাক্ষ বলবে—আপনি যে সেরে উঠেছেন সেইটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তারচেয়ে বেশী কিছু আমি চাই না।

মণিমালা এবার বলতে পারে—কিন্তু নিজে থেকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাতে কি পারি না।

এইবার হ্যাঁ, এইবার কমলাক্ষের মুখ থেকে ঝকঝকে উজ্জ্বল উত্তর বেরিয়ে আসতে পারে—কৃতজ্ঞতা মনের জিনিষ, তার জন্যে কোন বাইরের সাক্ষীর দরকার হয় না।

মণিমালা একটু হাসবে কি! নিশ্চয় হাসবে—সে সকৌতুক একটু হেসে বলবে হয়ত—কিন্তু সাক্ষী যদি থাকেই তাতে আপনার আপত্তি এত কিসের!

এতক্ষণে তারা হয়তো কাছাকাছি দুটি সোফায় বসেছে। কমলাক্ষ হেসে বলবে—আপত্তিটা কেন তা সত্যি করে বলব ?

নিশ্চয় বলবেন, সত্যি কথাই ত' শুনতে চাই।

আপত্তি এই জন্যে যে উপহার জিনিষটা নগদ বিদায়ের মত—তাতে কৃতজ্ঞতার একেবারে সব শোক বোধ হয়ে যায়—বাকি কিছু থাকে না।

স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, মণিমালার সুঠাম তনুদেহ এবার হাল্কা হাসির ঢেউয়ে দুলে উঠেছে।

হাসতে হাসতে সে বলবে—আপনি তো ভয়ানক লোক।

আপনার ভাঙা হাড় জোড়া দেবার পরও এই অপবাদ ?—বলবে কমলাক্ষ।

মণিমালা গম্ভীর হবার ভাণ করে বলবে—ভাঙা হাড় জোড়া দিয়েছেন সত্যি, কিন্তু কৃতজ্ঞতার সুদ যে সেই সঙ্গে চক্রবৃদ্ধি হারে আদায় করতে চান।

তারপর। তারপর কমলাক্ষের দিবাস্বপ্ন হঠাৎ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ড্রইংরুমের ওপাশের সমস্ত দরজা জুড়ে যে বিরাট বপুটি দেখা দিলো সেটি মণিমালা নয়, বড় তলাপাত্রের। বজ্রবাহন বৈশাখের মেঘের মত মুখ নিয়ে তিনি এগিয়ে আসেন কমলাক্ষের দিকে। হাতে তাঁর কমলাক্ষের দেওয়া কার্ড। তাঁর স্থূল মুখের সাতপুরু চর্বি ভেদ করে কোন ভাবাবেগেরই আত্মপ্রকাশ করা সহজ নয়! তবু কমলাক্ষের বুঝতে দেরী হয় না কি মনোভাব নিয়ে এসেছেন।

নিজের অজ্ঞাতে কমলাক্ষ সন্ত্রস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল, কার্ডটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বড় তলাপাত্র বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন, এ কার্ড আপনার ?

কমলাক্ষ জিহ্বায় কেমন একটু আড়ষ্টতা অনুভব করে শুধু মাথা নাড়লে।

আপনি ডাক্তার ?—প্রশ্ন হ'ল আবার।

কমলাক্ষ অনেকটা সামলে নিয়ে একটু ভেবে বলল,—'কাডেই তো লেখা আছে।

উত্তরের স্পর্ধাটা বড় তলাপাত্রকে বিচলিত করেছে একটু বোঝা গেল তাঁর স্থূল দেহ যেন আরেকটু স্ফীত হয়ে উঠল।

'কার্ডের' লেখা বিশ্বাস করতে হলে আপনার চেহারা দেখে তো ভদ্রলোক বলে বিশ্বাস করতে হয়। '—বড় তলাপাত্র গর্জন করে উঠলেন।

কমলাক্ষ এবার বেশ সামলে নিয়েছে, মৃদু হেসে বললে,—'এ প্রশংসায় সুখী হলুম।'

বড় তলাপাত্র একেবারে ফেটে পড়েন আর কি। গর্জেনের মাত্রা ছাড়িয়ে বললেন,—'এ কার্ড আপনি কেন পাঠিয়েছেন?

'যে জন্যে কার্ড পাঠায়. দেখা কববার জন্যে।

'দেখা করবার জন্যে। মণির সঙ্গে আপনার পরিচয়?'

'যৎসামান্য পরিচয় ডাক্তার হিসাবে। আহত হবার পর আমি তাঁর প্রথম চিকিৎসা করেছিলাম।'

বড় তলাপাত্র অবজ্ঞাসূচক একটা শব্দ করলেন।—'সেই সূত্র ধরে আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান। এতদূর আপনার স্পর্ধা। জানেন আপনাকে কি করতে পারি।'

'জানি বই কি। অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারেন। এজন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি।'

এ উত্তরে বড় তলাপাত্র একটু বোধ হয় বিচলিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—'মণির সঙ্গে আপনার কি দরকার?'

'সেটা কি আপনাকে বলতে হবে?'

বড় তলাপাত্র আবার ফেটে পড়লেন, 'নিশ্চয় হবে আলবৎ হবে। আপনি ভেবেছেন কি?'

'ভেবেছিলাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে বলব।'

'তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না জেনে রাখতে পারেন।'

'বেশ! তাহলে আপনাকেই জানিয়ে যাচ্ছি',—কমলাক্ষ পকেট থেকে ঘড়ির কেসটা বার করে খুলে তলাপাত্রের সামনে ধরে দিয়ে বললে —'এইটে তাঁকে ফেরৎ দেবেন।'

হাতঘড়িটা দেখবার পর এরকম একটা ফল হবে কমলাক্ষ নিজেও আশা করতে পারেনি। বড় তলাপাত্রকে সে শুধু একটু চমকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন উত্তেজনায়।

'এ ঘড়ি আপনি কোথায় পেলেন?'—উত্তেজনায় তাঁর মুখ দিয়ে কথাই বেরুতে চায় না।

কমলাক্ষ এখন শান্ত আত্মস্থ। ধীরভাবে সে বললে—'মিস তলাপাত্র এটি আমায় উপহার পাঠিয়েছিলেন।

'উপহার পাঠিয়েছিলেন। আপনাকে?—বড় তলাপাত্রের গলার স্বরে অবিশ্বাসের স্পষ্ট পরিচয়।

হঠাৎ তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চাকরের ডাক পড়ল। ডাক পড়ল ছোট ও মেজ তলাপাত্রের। বাড়ীতে রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল বলা যেতে পারে।

কমলাক্ষ অনেকক্ষণ থেকেই সমস্ত ব্যাপারটায় অত্যন্ত বিরক্ত ও হতাশ হয়ে উঠেছিল। এবার বললে—আমি তাহলে চললাম। মিস তলাপাত্রকে বলে দেবেন যে তাঁর এ উপহার আমি গ্রহণ করতে পারলাম না বলে অত্যন্ত দুঃখিত।

'দাঁড়ান, এরই মধ্যে যাবেন কোথায়?'—বড় তলাপাত্রের মুখে অত্যন্ত কুটিল একটা হাসি যেন খেলে গেল।

ঈষৎ সন্দিগ্ধ স্বরে কমলাক্ষ জিজ্ঞাসা করলে—'আমার এখানে থাকবার আর কোন দরকার আছে?'

'আছে বই কি? আপনাকেই তো এখন আমাদের দরকার—বলে

বড় তলাপাত্র এবার আগন্তুক ছোট ও মেজর সামনে হাতঘড়িটা তুলে ধরলেন।

আর একটা উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল।

'এইটে তো!'—বললেন মেজ তলাপাত্র উত্তেজিত ভাবে।

উত্তেজনায় ছোটর গলা দিয়ে কোন কথাই বেরুল না!

বড় তলাপাত্র কমলাক্ষকে নির্দেশ করে বললেন—ইনি বলছেন, মণি ওকে এটি উপহার পাঠিয়েছেন।

তিন জোড়া সন্দিগ্ধ সরোষ চক্ষু তার ওপর নিবদ্ধ। কিছু বুঝতে না পেরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করলেও কমলাক্ষ বললে—'আপনারা কি সে বিষয়ে সন্দেহ করছেন?'

তিন তলাপাত্র নীরব অবজ্ঞাভরে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

কমলাক্ষ এবার রীতিমত চটে উঠল।—'আপনারা কি মনে করেন আমি নিজে গল্প বানিয়ে বলছি। আলাপ করবার জন্যে নিজের পয়সায় ঘড়ি কিনে এখানে এসেছি মনে করেন?'

'সে রকম কিছুই মনে করি না। এ ঘড়ি মণির আমরা জানি।'—বড় তলাপাত্র গম্ভীর স্বরে জানালেন।

'তবে?' 'অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে কমলাক্ষ।'

'তবে এ ঘড়ি আপনি পেলেন কোথায়?'

কমলাক্ষ এবার হেসে উঠলো এদের মূঢ়তায়—'কতবার বলব মিস তলাপাত্র আমাকে উপহার দিয়ে পাঠিয়েছেন?

মেজ তলাপাত্র বিদ্রূপ করে উঠলেন—'নিজেহাতে দিয়ে এসেছেন?'

'না, চিঠি দিয়ে একজন লোকের হাতে পাঠিয়েছেন।'

'হু, বুঝেছি। সে চিঠি আছে?'

সে চিঠি কি আমি সঙ্গে করে এনেছি? সে চিঠি আছে আমার ডাক্তারখানায়। কিন্তু এসব প্রশ্নের অর্থ কি? এ হাতঘড়ি তো চোরাই মাল নয় যে এত জেরা করছেন?

তিন তলাপাত্রের হাসি শোনা গেল। বড় তলাপাত্র কুটিল ভাবে মুখভঙ্গি করে বললেন—'চোরাই মাল কি না আপনি ভাল করেই জানেন। আজ তিন হপ্তা হ'ল এ ঘড়ি বাড়ী থেকে লোপাট হয়েছে।'

কমলাক্ষ এবার উচ্চৈঃস্বরে না হেসে পারলে না। হাসি থামিয়ে বললে,—'আপনাদের কি ধারণা আমি চুরির মাল পেয়ে তা নিজে যেচে ফেরৎ দিতে এসেছি। তাই যদি এসে থাকি তো আমার দোষটা কোথায়?'

'এসব কথা পুলিসের কাছে বলবেন'—বড় তলাপাত্র গম্ভীর স্বরে বললেন।

পুলিস! কমলাক্ষ এবার—সত্যি একটু শঙ্কিত হয়ে উঠল। এরা পয়সা ওয়ালা ক্ষমতাবান লোক। সে হাজার নির্দোষ নিরপরাধ হ'লেও এদের দুটো কথায় পুলিসের কাছে তার যথেষ্ট হাঙ্গামা পোহাতে হতে পারে। নির্দোষ বলে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেলেও জবাবদিহি দেবার যে সমস্ত অসুবিধায় তাকে পড়তে হবে তা বড় কম নয়। শেষ পর্যন্ত এই তার ভাগ্যে ছিল। মণিমালা কি না এই জন্যেই তাকে এমন সর্বনাশক উপহার পাঠিয়েছিল।

দোষ অবশ্য তার নিজের। উপহার ফেরৎ দেবার উদারতা দেখাতে না এলে এসব কোন গোলই উঠত না। কিন্তু মণিমালারই বা এ কি রকম ব্যবহার। তাকে ঘড়ি উপহার দিয়ে পাঠিয়ে সে কি বাড়িতে তা চুরি গেছে বলে প্রচার করেছে। এ রকম—

ভয়ে দুর্ভাবনায় কমলাক্ষের গলা এবার শুকিয়ে উঠল। কি এখন সে করতে পারে? কি হবে এর পর?

যা হল তা কিন্তু ভারী আশ্চর্য, আশ্চর্য হলেও অসম্ভব তাকে বোধ হয় বলা যায় না। একটা আকস্মিক ঘটনার যে কাহিনীর সূত্রপাত আর একটা আকস্মিক ঘটনা তাতে নতুন সংযোজন করতে যেন উদ্যত, এ আর এমন কি বিচিত্র!

হঠাৎ বাইরে তরুণীকণ্ঠে উচ্চহাসি শোনা গেল একটা মোটর থামার আওয়াজের সঙ্গে। স্বয়ং মণিমালাই একজন সুবেশ সুঠাম চেহারার যুবকের সঙ্গে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে তাদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

তিন তলাপাত্র ক্ষণকের জন্য তাঁদের শিকারকে ভুলে স্মিত-হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

আরে অনিন্দ্য যে! এস এস। কাল না তোমার আসার কথা মণি তো কালকেও এরোড্রামে গেছল তোমার জন্য।

অনিন্দ্য এগিয়ে এল,—না কাল আসতে পারিনি—ইঞ্জিনের গোলামালে বসরায় একদিন আটকে থাকতে হয়েছে। প্লেন একদিন লেট।

বড় তলাপাত্র কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু অনিন্দ্যের দিকে চেয়ে তাঁর কিছু বলা হল না।

সোজা কমলাক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়ে অনিন্দ্য তখন বললে—একি, আমাদের কমল না! কি আশ্চর্য? তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে ভাবতেই পারিনি। তারপর সকলের দিকে ফিরে সে সোৎসাহে ইংরাজীতে জানালে—'জানেন, মেডিক্যাল কলেজে কমল ছিল সব চেয়ে ব্রিলিয়েণ্ট। এ বাড়ীর স্বাস্থ্যের ভার উপযুক্ত হাতেই পড়েছে দিখছি। কমলাক্ষের পিঠে আর একটা চাপড় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্যের উচ্চ হাসিতে ঘর মুখর হয়ে উঠল।

* * *

মণিমালা এবং তার সঙ্গে অরুণ অনিন্দ্যের আবির্ভাবে ঘরের আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে গেল। ভয়ের ভাব কাটিয়ে মন রুখে উঠলো—আমাকে পুলিসের হাতে দেবে—এখন ঐ সাক্ষী হাজির! কি করবে?

কিন্তু সেকথা ছেড়ে অনিন্দ্যের পানে চেয়ে কমলাক্ষ বললে—অনিন্দ্য !···না ভাই, আমি এখনও স্যার হইনি, বা বিলেতে ঘুরে আসিনি, কাজেই আমার এ বাড়ীতে চিকিৎসার ভার গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। আমি এসেছিলুম অন্য কাজে এবং এসে বিপন্ন হয়েছি।

কথাটা বলে কমলাক্ষ একবার মণিমালার পানে চাইলো। ভেবেছিল মণিমালার তরফ থেকে একটু উল্লাস ও উৎসাহের সাড়া মিলবে। কিন্তু তা মিললো না।

তার পরিবর্তে কমলাক্ষ দেখলো, মণিমালার ইন্দীবর তুল্য চোখের দৃষ্টি সহসা মেঘেয় মত মলিন হয়ে গেল। মণিমালা সেখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না দ্রুত পায়ে সে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

মণিমালা এলো দোতলায় তার নিজের ঘরে। এসে খোলা জানালার সামনে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রথম প্রশ্ন মনে জাগলো, ডাক্তার এতকাল পরে এ বাড়ীতে হঠাৎ এলেন কেন? বড় তলাপাত্রের হাতে তার হাতঘড়িটাও সে লক্ষ্য করেছিল। ও হাতঘড়িই বা তলাপাত্রের হাতে এলো কি করে।

ও হাতঘড়ির সম্বন্ধে বাড়ীতে কি কলরব উঠেছিল মণিমালার মনে পড়লো। মণিমালা বলেছিল হাতঘড়ি হারিয়ে গেছে। তিন তলাপাত্র মাথা নেড়ে তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন—উহুঁ, কখনো নয়। এ চুরি এবং তখনি পুলিসে খবর পাঠানো হয় পুলিস এসে দুটি নিরীহ নতুন চাকরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তাদের ঃ সে অকারণ নিগ্রহ মনিমালার বুকে কণ্টক-ব্যথার সৃষ্টি করেছিল। তবু ভয়ে মণিমালা একথা কাউকে জানাতে পারেনি—না গো না চুরি নয় হারানো নয়। সে হাতঘড়ি আমি—

প্রায় তিন হপ্তা পরে ঘড়ি এবং অকাট্য প্রমাণ না পেয়ে পুলিশ সে চাকর দুটিকে খালাস দেয়। খালাস পেয়ে এ বাড়ীতে ফিরে তারা

শুনলে, এ বাড়িতে তাদের অন্ন-জলের উপায় হবে না। বেচারীর যে সুনামটুকু মাত্র সম্বল করে জীবিকার্জন করছিল তাদের সে সম্বল চূর্ণ হয়ে গেল মণিমালার দোষে। সেজন্যে মণিমালার যাতনার সীমা ছিল না এবং অপরাধের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত সে করেছিল নিজের সঞ্চয়ের টাকাকড়ি তাদের হাতে তুলে দিয়ে।

তারপর ও হাতঘড়ি সম্বন্ধে কোনো দিকে আর কোনো কথা ওঠেনি। মণিমালা ভেবেছিল, ও হাতঘড়ি-নাট্যের যবনিকাপাত হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। এখন সে হাতঘড়ি এবং তার সঙ্গে সাতঘড়ির বর্তমান অধিকারীকে এ বাড়ীতে দেখে ভয়ে সংশয়ে মণিমালা যেন পাংশু হয়ে গেল।

যদিও ডাক্তারবাবু বলে থাকেন এ হাতঘড়ি মণিমালা তাঁকে উপহার দিয়েছে কিন্তু সেথা বলবার কি প্রয়োজন ঘটতে পারে?

চিন্তার তরঙ্গে বিপর্যস্ত হয়ে মন তার ভেসে চললো অজানা কোন লক্ষ্যহীন আবর্তে। কি কারণ? কি প্রয়োজন হতে পারে?

সে এসে দেখেছে—তলাপাত্রদের চোখের দৃষ্টিতে অগ্নিকণা এবং ডাক্তারবাবুর বিবর্ণ মুখ—কেন? কেন?

কাকেই বা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে? নিরুপায় দুশ্চিন্তায় শ্রান্ত দেহমন নিয়ে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো।

ওদিকে নীচেকার ড্রইংরুমে নাটক তখন বেশ জমে উঠেছে। মণিমালাকে নিঃশব্দে চলে যেতে দেখে কমলাক্ষ কেমন মুষড়ে পড়লো তার মুখে আর কথা সরলো না।

বড় তলাপাত্র চাইলেন অনিন্দ্যর দিকে বললেন—'একে তুমি তাহলে চেনো?

অনিন্দ্য বললে,—ওকে চিনি না! কলেজে বড় বড় সমস্যায়ও ছিল আমাদের একমাত্র কাণ্ডারী—তা আপনারা একে পেলেন কি করে—স্যার গড়গড়িদের ছেড়ে একে ধরেছেন?

মেজো তলাপাত্র বললেন—কিন্তু উনি এ বাড়ীতে ডাক্তারী করেন না এবং ডাক্তারী করতে আসেননি।

বড় তলাপাত্র বিস্মিত স্বরে বলবে,—আমরা আনাইনি, উনি নিজে এসেছেন—এবং যে কারণে এসেছেন তা শুনলে তুমি খুশী হবে না।

অনিন্দ্য বিস্ময় সীমাহীন হয়ে উঠলো। কৌতুহলী দৃষ্টিতে সে একবার চাইলো কমলাক্ষর পানে, তারপর বড় তলাপাত্রের পানে।

বড় তলাপাত্র তখন বিজয়গর্বে হাতঘড়িটা অনিন্দ্যর সামনে ধরে বললেন,—'এ হাতঘড়িটাকে তুমি চেনো নিশ্চয়?

অনিন্দ্য বললে—'দেখি '

বলে ঘড়িটা সে নিল নিজের হাতে—তারপব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা নেড়ে চেড়ে দেখে অনিন্দ্য বলেন—এটা আমি দু'বছর আগে মণিকে দিয়েছিলুম না—তার জন্মদিনে?

ছোট তলাপাত্র বললেন—'আজ ইনি হঠাৎ এ ঘড়ি নিয়ে এখানে এসেছেন, বলছেন, এ ঘড়ি ফেরৎ দিতে এসেছেন মণিমালাকে। আমাদের হাতে নয়, বুঝেচো-এই দেখ ওর কার্ড এবং কার্ডে ওর লেখা চিঠি।

কার্ডখানা বড় তলাপাত্র দিলেন অনিন্দ্যর হাতে। অনিন্দ্য পড়লো —কার্ডে লেখা আছে।

শ্রীমতী মণিলালা দেবী।

হাত ঘড়িটি নিয়ে এসেছি। আপনার কাছে আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে। যদি দয়া করে দর্শন দেন তাহলে কৃতার্থ হবো।

—ডাক্তার কমলাক্ষ।

চিঠি পড়ে অনিন্দ্য চাইলো কমলাক্ষের পানে।

কমলাক্ষ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল যেন ফৌজদারী আদালতের আসামী। অনিন্দ্য যেন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তলাপাত্ররা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী

দিয়ে লম্বা একটা চার্জ খাড়া করেছে। অনিন্দ্যের দৃষ্টিতে এমন প্রশ্ন উথলে উঠছে—এবার কমলাক্ষের জবাবদিহির পালা।

কথাটা সে খুলে বললে, এমন সময় সেজো তলাপাত্র হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'ভদ্র ঘরের মেয়ে, এ ভাবে তাকে চিঠি লিখে তার অভিভাবকদের আড়ালে তার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া—তুমিই বলো অনিন্দ্য সেটা কতখানি ভদ্রতা। এই কি তোমার মেডিকেল কলেজের ব্রিলিয়েণ্ট বয়ের উচিত কাজ হয়েছে?

তিলকে তাল করবার বিরাট প্রয়াস দেখে এতখানি বিরুদ্ধতার মধ্যেও কমলাক্ষের হাসি পেলো—কিন্তু এখন হাসির সময় নয়। তাই কোন মতে হাসি চেপে কমলাক্ষ বললে—'আমার বক্তব্য তুমি নিশ্চয় শুনবে অনিন্দ্য—ওদের কথা শুনে আর যে কোন লোক আমাকে অভদ্র ইতর মনে করুক, আশা করি তুমি করবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। তার কারণ আমাকে তুমি জান দীর্ঘকাল ধরে।

ব্যাপারটা এত অস্পষ্ট যে তা থেকে অনিন্দ্যর মনে কোন ধারণা ছাপ ফেলতে পারেনি—কৌতূহলে তার মন উদ্বেল। সে বললে—বলতো কি হয়েছে?

কমলাক্ষ তখন মণিমালার সেদিনকার সেই মোটর দুর্ঘটনা এবং হাত ভাঙ্গা প্রভৃতির কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করে বললো—'আমি সেদিন আমার কর্তব্য করেছিলুম মাত্র—তার জন্য কোন কিছু পুরস্কারের প্রত্যাশা করিনি। মিস্ তলাপাত্র কি কারণে জানি না, আমাকে ছোট একটু শ্লিপ লিখে এই হাত ঘড়িটি পাঠান। শ্লিপে লিখেছিলেন কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন—সেইদিন থেকে আমি প্রতিদিন চিন্তা করেছি, এ উপহার আমার রাখা উচিৎ কি না। পুরস্কার নেবো না স্থির করতে আমার দেরি হয়নি—শুধু একজন ভদ্র মহিলার দান ফেরৎ দিলে পাছে তার অমর্যাদা হয়, এইজন্য মনে দ্বিধা জেগেছিল দীর্ঘকাল। আজ কিন্তু সে দ্বিধা ত্যাগ করে এখানে

এসেছিলুম। ফেরৎ দেওয়ার কারণ বুঝিয়ে দিলেও যদি তিনি মনক্ষুণ্ণ হন, সেজন্য মার্জনা চাইবো, তাই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলুম। সে এক্সিডেন্ট বা হাত ঘড়ির সঙ্গে আমার যা কিছু সম্পর্ক, তা মিস তলাপাত্রের সঙ্গে মেসার্স তলাপাত্রের সঙ্গে নয়—তাই এঁদের সঙ্গে দেখা করা কোন প্রয়োজন আমি বোধ করিনি।

নাটক নভেল গোড়ার বিশ পঁচিশ পাতা না পড়ে সে কপাতার সংক্ষিপ্ত সার অপরের মুখে শুনে নাটক নভেল পড়তে বসলে ঘটনাগুলোর যেমন অস্পষ্টতা থাকে, কমলাক্ষর বিবরণ এবং তলাপাত্রের মন্তব্যাদি শুনে অনিন্দ্যর মনে সমস্ত ব্যাপারটা তেমনি ঝাপসা ঠেকছিল। খুব সুস্পষ্ট হলো না। এর মধ্যে মণিমালার মত বড় এক্সিডেন্ট হয়ে গেছে—এবং সে এক্সিডেন্ট উপলক্ষ করে এ বাড়ীর কমলাক্ষর ক্ষীণ সংযোগ। তারপর অভিভাবকের অন্তরালে মণিমালা গোপনে কমলাক্ষকে পাঠালো উপহার এবং সে উপহার অনিন্দ্যের দেওয়া তার পছন্দ মতো এই দামী হাতঘড়ি—অনিন্দ্যের মনে হলো সে যেন একখানা নভেলের মাঝখানে পরিচ্ছেদের মধ্যে কোন ফাঁকে ঢুকে পড়েছে। এসব ঘটনার বিন্দুবাষ্প মণিমালা তাকে বললে না। এরোড্রাম থেকে বাড়ী আসতে পথে মণিমালা তাকে অনেক খবরই বলেছে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এতবড় খবরটা···

মনের গহনে একটু অভিমান, একটু ক্ষোভ···

কিন্তু সে অভিমান মাথা তুলতে পারলে না—মেজো তলাপাত্রের রুদ্রস্বর আঘাতে সে অভিমান মাথা গুজে মনের কোণে লুটিয়ে পড়লো। মেজো তলাপাত্র বললেন—একথা তুমি বিশ্বাস করো অনিন্দ্য? আমাদের কাছে এসে আমাদের কাছে সব কথা বলে মণিমালার সঙ্গে দেখা করবেন বলতে পারতেন তো।

বড় তলাপাত্র বললেন, তাছাড়া, ওর অভদ্রতার প্রথম পরিচয় পাই যেদিন মণির ঐ মোটর এক্সিডেন্ট ঘটে। মণিকে উনি তাঁর

ডিস্পান্সারীতে নিয়ে গেলেন সেখানে আমার ড্রাইভার এবং পথের যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতেন মণি এ বাড়ীর মেয়ে। ওর ডিস্পেন্সারী আমাদের বাড়ী থেকে দূরে নয়—ওর উচিত ছিল আমাদের বাড়ীতে আনা, না হয় সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া। তা না করে পরের বাড়ীর ডাগর মেয়েকে অযাচিতভাবে নিজের ঘরে তোলা —এটা আমি খুব গর্হিত বলে মনে করি। বিশেষ ওঁর নিজের বয়স যখন বেশী নয়।

একথা শুনে কমলাক্ষর মন ঘৃণায় বিরক্তিতে-রী-রী করে উঠল মেয়ের অতবড় বিপদের সময় মানুষ এ দিকটায় এতখানি সচেতন থাকে।

মেজো তলাপাত্র বললেন—বলছেন, মণি ওঁকে চিঠি লিখে এ ঘড়ি পাঠিয়েছিলেন। তা যদি হয় তো সে চিঠি বাড়ীতে রেখে শুধু ঘড়িটি নিয়েই বা আসেন কি বলে! উনি ভেবেছিলেন এ বাড়ীতে আমরা নেই —নিঃশব্দে এসে। মণির সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও মণি এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে—এমন ধারণাই বা ওঁর মনে জাগে কি করে। মণি ভদ্র ঘরের মেয়ে—

বড় তলাপাত্র বললেন—ওর কথার ভাবে মনে হয়, হাতঘড়ি ফেরৎ দেওয়া নয়, আমাদের আড়ালে মণির সঙ্গে আলাপ করা। হাতঘড়িটা ছিল শুধু উপলক্ষ্য।

তিন তলাপাত্রের বাক্যজলে অনিন্দ্য এমন বিজড়িত অভিভূত হয়ে পড়লো যে এসব কথা শুনে সে কি বলবে বা কি করবে, সে সম্বন্ধে কোন কিছু নির্ধারণ করতে পারছিল না। এতখানি পথ—কি আশা, কি উল্লাসের স্বপ্ন সে বুনে এসেছে—এতদিনকার কথা জমে আছে—অভ্যর্থনার কতখানি আবেশ মাধুর্য সম্ভাবনা করেছিল—সেসব কোথায় গেল ছিন্ন বিপর্যস্ত হয়ে এ বাক্য-সঞ্চারে!

বড় তলাপাত্র বললেন—'নিশ্চয় এ ঘড়ি সেই চোর বেটারা ওকে

বেচে এসেছে আর উনি ঐ ঘড়ি নিয়ে সুযোগ বুঝে এসেছেন ভদ্র ঘরের মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবার লোভে।

ছোট তলাপাত্র বললেন—মণিমেলা ও ঘড়ি দেয়নি—দিতে পরে না।

ঘরের মধ্যে উত্তেজনার ঝড় বইছে যেন, এবং চকিতে সে ঝড়ের মুখে দাঁড়ালো নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে মণিমালা।

চকিতে ঝড় হলো রুদ্ধ—যেন মন্ত্রবলে!

শান্তভাবে মণিমালা বললে—'আমিই চিঠি লিখে এ হাতঘড়ি ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়েছি। উনি আমাকে সেদিন অতবড় বিপদে রক্ষা করেছেন—সেই ওঁর ওপর তোমাদের নির্লজ্জ অবিচার আমি সহ্য করতে পারিনি—তাই আমি এ ঘড়ি ওঁকে পাঠিয়েছি—

তিন তলাপাত্রের মুখের ওপর একথা যেন দারুণ অট্টহাস্য করে উঠলো।

মেজো তলাপাত্র ফোঁস করে উঠলেন—'কিন্তু জানো, এ ঘড়ি কে তোমাকে উপহার দিয়েছে।

মণিমালা বললে, জানি। অনিন্দ্য। এই উপহারটিই আমার কাছে সবচেয়ে দামী ছিল বলে ঐটিই আমি দিয়েছি ডাক্তারবাবুকে।

একথা শুনে তাঁরা বিমূঢ়ের মতো চাইলেন অনিন্দ্যর পানে সে দৃষ্টির অর্থ আমরা এতক্ষণ প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি বাপু—যুদ্ধে আমরা এখন শ্রান্ত। এখন তুমি লড়ো—

কিন্তু অনিন্দ্য আর কোন কথা বললে না নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। মণিমালা এবার চাইলো কমলাক্ষের পানে, বললে—'আপনি এসেছিলেন ও হাতঘড়ি আমায় ফিরিয়ে দিতে?

অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে কমলাক্ষ চাইলো মণিমালার পানে। তার মুখে কথা ফুটলো না।

মণিমালা—না। এ ঘড়ি দয়া করে ফেরৎ দেবেন না। ফেরৎ দিলেও ও ঘড়ি আমি নেব না।

এই অবধি বলে সে দেখলো ঘড়িটি রয়েছে অনিন্দ্যর হাতে অনিন্দ্যর হাত থেকে ঘড়িটি নিয়ে মণিমালা বললে—'চিঠি লিখে পরের হাতে ঘড়ি পাঠিয়ে আমি তৃপ্তি পাইনি, আজ নিজে হাতে করে এ ঘড়ি আপনাকে দিচ্ছি।—নিন।

ঘড়িটা মণিমালা একরকম জোর করে কমলাক্ষের হাতে গুজে দিলে।

কমলাক্ষ বললে—আমাকে মাপ করুন আপনার এ দয়া আমার চিরদিন মনে থাকবে কিন্তু এ ঘড়ি আমি নিতে পারবো না।

'আপনাকে নিতেই হবে। মণিমালা বললে—আমার মর্যাদার কথা ভেবে দয়া করে এটি নিন। নিজে না রাখেন আপনার কম্পাউণ্ডারকে দেবেন, না হয় পথের কোন লোককে। এর চেয়ে দামী উপহার দেবার সামর্থ্য আমার সেদিন ছিল না, আজও নেই। যদি কোনদিন দেবার মতো এর চেয়ে দামী উপহার আপনাকে দিতে পারি,—জানি তাতেও এ বাড়ীর যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, তার প্রতিকার হবে না। তবু আমি তা দিতে কুণ্ঠির হবো না কিন্তু আর এখানে নয় আপনি সহ্য করতে পারলেও এ বাড়ীতে আপনার লাঞ্ছনা আমার সহ্য হচ্ছে না। আপনি যান, বাড়ী যান।'

এই কথা বলে একরকম হাত দিয়ে ঠেলে সদর পর্যন্ত এনে কমলাক্ষকে মণিমালা এ গৃহ থেকে বিদায় দিল।'

বিদায় দিয়ে মণিমালা এ ঘরে ফিরলো না ফিরলো আপনার দোতলার ঘরে।

নীচেকার ঘরে তখন যেন বজ্রপাত হয়ে গেছে। তিন তলাপাত্র মুষড়ে এতটুকু। মণিমালা কি নাটকাভিনয় করে গেল - বিশেষ করে অনিন্দ্যর সামনে। এই অনিন্দ্যর সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে শুধু অনিন্দ্যর এই বিলেত থেকে চোখের চিকিৎসাবিদ্যার স্পেশালিষ্ট হয়ে ফিরে আসবার যা ওয়াস্তা।

সেই অনিন্দ্যর সামনে অনিন্দ্যর দেওয়া সাধের উপহার ঐ হাত ঘড়ি তার উপর ডাক্তারকে নিয়ে এতখানি বাড়াবাড়ি।

দুর্ভাবনায় তাঁদের মনের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল। অনিন্দ্যর পানে তাঁরা চাইলেন—।

অনিন্দ্য বললে—আমি এখন আসি। ড্যাণ্ডি হোটেলে টেলিগ্রাম করেছিলাম—আমার জন্যে ঘর রাখতে—

একথা বলে অনিন্দ্য আর দাঁড়ালো না।

মণিমালার দেহভার একটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়েছিল। ভাবছিল সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে—ছিঃ ছিঃ, কি কুরুক্ষেত্র পর্বই না এরা করলেন। ডাক্তারবাবু কি ভাবলেন।

লজ্জায় ক্ষোভে মণিমালা কেমন অবসন্ন হয়ে পড়লো।

তারপর সে ঘরে তিন তলাপাত্রের প্রবেশ।

বড় তলাপাত্র বললেন—তুমি যে খুব জেদী মেয়ে তা জানতুম, তবু—

মণিমালা বললে—কি তবু?

বড় তলাপাত্র বললেন—সত্যি তুমি চিঠি লিখে ও ঘড়ি ঐ ডাক্তারকে পাঠিয়েছিলে?

মণিমালা বললে, পাঠিয়েছিলুম। সেকথা তো বলে এসেছি, আবার কেন?

ছোট তলাপাত্র বললেন—'তাহলে যেদিন পুলিস এসে চুরি করেছে বলে যে চাকর দুটোকে ধরে নিয়ে গেল, সেদিন কেন সেকথা বলোনি?'

মণিমালা বললে—'কেন বলিনি, আজ সে কথা বলতে পারবো না।'

মেজ তলাপাত্র বললেন—বিনাদোষে তারা সইলে অতখানি নিগ্রহ কেন?

মণিমালা বললে—'তার গ্লানি আমি যতখনি ভোগ করেছি, এমন তোমরা কেউ ভোগ করোনি, কোনদিন ভোগ করবে না।'

ছোট তলাপাত্র বললেন—'অনিন্দ্যর উপহার এমনি করে তুমি বিলিয়ে দিয়েছ, এতে অনিন্দ্য খুবই রাগ করেছে।'

মণিমালা বললে—তোমাকে সেকথা বলেছে অনিন্দ্য ?

বড় তলাপাত্র বললেন—না হলে আসবামাত্র সে চলে যাবে কেন। একটু বসলো না, এক পেয়ালা চা পর্যন্ত মুখে দিলে না।

মণিমালার মনে যেন ছুঁচ ফুটলো—সে চমকে উঠলো। বললে—অনিন্দ্য চলে গেছে ?

ছোট তলাপাত্র বললেন—যাবে না ? এরকম আচরণ সে তোমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেনি—

বড় তলাপাত্র বললেন—তাছাড়া তুমি এখন আগেকার মতো ছোট্টটি নেই, বুঝে-সুঝে কাজ করতে হয়।

মণিমালা এ-কথার কোন জবাব দিলে না, চুপ করে বসে রইলো। মন কেবলি বলতে লাগলো—রাগ—রাগ বটে।

তিন তলাপাত্রের চোখে কিসের ছায়া।

মণিমালা বললে—আর কোন কথা আছে তোমাদের ?

তিন তলাপাত্র প্রায় সমস্বরে বললেন—অনিন্দ্য গেছে ড্যাণ্ডি হোটেলে, আধঘণ্টার মধ্যেই সে হোটেলে পৌঁছবে। তাকে টেলিফোন করো, আজ রাতে খেতে বলো—বুঝলে ?

মণিমালা বললে—ভেবে দেখি, কিন্তু আমায় তোমরা এখন একটু ছুটি দাও। আর তোমাদের কোন কথা আমি শুনতে পারবো না, শুনলে জবাব দেবো না।

তিন তলাপাত্র নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

মণিমালার মন আক্রোশে ফুলে উঠলো—রাগ। কেন শুনি। তুমি ভেবেছো—

ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলের দিকে যেতে যেতে অনিন্দ্যের মনে হলো যে ওরকম হঠাৎ চলে আসাটা তার উচিত হয়নি। মণিমালার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করা হয়নি।—অথচ ব্যাপার কিছুই না—সামান্য একটা ঘটনাকে তিন তলাপাত্র অকারণে এবং অন্যায় রকম ফাঁপিয়ে তুলেছেন—ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁদের বুদ্ধি একেবারেই খোলে না। অনিন্দ্য মানুষটা সেন্টিমেন্টাল নয়, কিন্তু তারই দেওয়া উপহার মণিমালা কমলাক্ষ ডাক্তারকে দিয়েছে দেখে প্রথমটায় তার মনে একটু ধাক্কা লেগেছিল বইকি। ব্যাপারটা অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। আর কিছু না, অতি সাধারণ ভদ্রতা, যে ভদ্রতাটুকু কোটিপতি তলাপাত্র জানেন না। সেই অ্যাকসিডেন্টর পর ওঁদেরই উচিত ছিলো, ডাক্তারকে মোটা রকমের একটা ফি পাঠিয়ে দেওয়া—তাতো তাঁরা করলেই না বরং ডাক্তার যখন সশরীরে এসে উপস্থিত হলো, তাকে যাচ্ছেতাই অপমান করলেন। মণিমালা ওবাড়ীর মেয়ে হলেও ওদের মতো নয়, এবং কমলাক্ষ দুর্ঘটনার সময় যে যথাসাধ্য করলো তাকে কৃতজ্ঞার সামান্য একটা নিদর্শন পাঠিয়ে মণিমালা অন্যায় তো কিছুই করেনি, বরং তার মার্জিত মনেরই পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ঐ হাত ঘড়ি—তা তলাপাত্র যা কঞ্জুস—কঞ্জুস বলেই সামান্য কাঠের ব্যবসা থেকে কোটিপতিতে এসে পৌঁছেতে পেরেছেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে একটা মেয়ে, তাকে ভাল রকম হাত খরচ পর্যন্ত এরা দেন না। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে বেচারা মণি ঐ হাতঘড়িটাই দিয়েছিলো পাঠিয়ে, গোপনেই পাঠিয়েছিলো। কারণ বাপ-জ্যাঠার মেজাজ তার ভালো মতোই জানা

আছে ? শেষ পর্যন্ত কি একটা বিশ্রী কাণ্ডই হতে পারতো, যদি না ঠিক সময়ে সে আর মণিমালা এসে পৌঁছাতো।

অনিন্দ্য ভেবে দেখলো, তার এরকম হঠাৎ চলে আসাটাই বিশ্রী হয়েছে। হোটেলে এসে স্নান করে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়ে মণিমালাকে টেলিফোন করলে।

'হ্যালো মণি—'

'কে অনিন্দ্য ?' শোনো, তুমি কি রাগ করে চলে গেছ ?

'কি আশ্চর্য !' আমি রাগ করবো কেন ?

'তুমি চলে যাওয়ার পর আমার বাপ আর জ্যাঠারা আমাকে তাই বোঝালেন।'

অনিন্দ্য হেসে বললে, আমি এইমাত্র ভাবছিলুম মণি, যে ওরা ব্যবসা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন বিষয়েই আর কিছু বোঝেন না।'

'যাক, তুমি রাগ করোনি তাহলে। বাঁচলুম। এইত এতদিন পর দেশে ফিরলে—তারপর আমাদের বাড়ীতে পা দিয়েই যদি রাগ করতে কি সাংঘাতিক কাণ্ড হতো ভাবোতো।'

'মণি, তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছো ?'

'কী আশ্চর্য ! আমি কেন ঠাট্টা করবো—শোন আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়ীতেই খেয়ো—কেমন ?'

'নিশ্চয়ই—'

'এই সাতটা নাগাদ এসো, কী বলো ?'

'আচ্ছা। শোনো মণি, আমি ও রকম হঠাৎ চ'লে এলুম বলে তুমি কিছু মনে করনি তো ?'

'ওতে আর মনে করার কি আছে। ভালোই করেছিলে—যা কাণ্ড, সেখানে তোমার অনুপস্থিতেই বাঞ্ছনীয় !'

'বাঃ তুমি পড়েছো বিপদে, আর আমি লেজ গুটিয়ে পালাবো।'

নিশ্চিন্ত হলুম অনিন্দ্য। অবলা বঙ্গললনাকে তুমি না হলে কে আর রক্ষা করবে।

'আরো দু' একটা কথা বলে অনিন্দ্য রেখে দিল টেলিফোন। মণিমালার শেষের কথাটা প্রায় ঠাট্টার মতোই শোনালো। কিন্তু অনিন্দ্য বিশেষ গায়ে মাখলে না কথাটা। ভেবেছিল দুপুরের খাওয়াটা সেরে একটু বিশ্রাম করেই যাবে তলাপাত্র-ভবনে, মণির সঙ্গে কাটাবে সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা। কিন্তু এই সন্ধ্যা ভোজের নিমন্ত্রণের জন্যই তাকে অপেক্ষা করতে হবে—সেই সাতটা পর্যন্ত।

অনিন্দ্য গেলো সাতটার একটু পরেই। নীচের ড্রইংরুমে মণিমালা একা বসে আছে—মূল্যবান আসবাবে-ঠাসা সেই বিশাল ঘরটিতে তাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না! অনিন্দ্য এগিয়ে এলো হাসিমুখে, মণিমালার পাশে বসে পড়ে বললে, 'আমার কী দেরী হয়ে গেছে মণি?'

মণিমালা বললে, সাতটাতেই তো আসবে বলেছিলে না?

আমি বলিনি, বলেছিলে তুমি। সাতটার আগেই যাতে চলে না আসি, তার জন্যে সারাদিন কি কঠোর সংগ্রাম আমাকে করতে হয়েছে তুমি তা বুঝবে না।

'অদ্ভুত আত্ম-সংযম তো তোমার!'

মণিমালার চোখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে অনিন্দ্য বললে, 'ছাখো মণি, আমার যেন মনে হচ্ছে তুমি একটু বদলে গেছ।'

তাই মনে হচ্ছে তোমার? কেন বলতো?

অনিন্দ্য হঠাৎ বললে 'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। দু'বছর আগে যে কথা বলেছিলে তা তুমি ভুলে গেছ?'

মণিমালা আস্তে আস্তে বললে—'সে তো ভুলে যাবার কথা নয়।'

অনিন্দ্যের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—'তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলে—এখনো সময় হয়নি ?'

'সে কথা এখন থাক।'

অনিন্দ্য মনে মনে বললে, মেয়েরা এমন 'লাজুকা' নিজের মনে তার কোন সংশয় ছিল না যে মণিমালা তারই স্ত্রী হবে। বলতে গেলে দু'বছর আগেই মণির জন্মদিনে যে ঘড়িটি উপহার দেয় সেদিন থেকেই এটা স্থির হয়ে আছে। তারপরে সে গেলো বিলেতে। ফিরে এসে সে অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের জীবন মিশে এক হয়ে যাবে, এটা সে প্রায় ধরেই নিয়েছিল এবং তলাপাত্র-ত্রয়ের মধ্যেও যে এ বিষয়ে মতভেদ নেই তাও অনিন্দ্য জানে। মণিমালা অবশ্য কোটিপতি-কন্যা, কিন্তু সত্যের খাতিরে একথা বলতেই হয় যে অনিন্দ্যের মতো চৌকোষ পাত্রও আজকাল বাংলা দেশে বিরল।

নিজের মনে অনিন্দ্য যে কথা জানে সে কথাটি সে মণিমালার মুখ থেকে শুনতে চায় তাই অন্য কোন কথার ছিপ ফেলে মণিমালার গভীরের কথাটি উপরে টেনে আনা যায় কি না, একথা সে যখন ভাবছে এমন সময় বেয়ারা এলো রূপোর ট্রের উপরে একখানা কার্ড নিয়ে। ট্রেটি মণিমালার সামনেই ধরা হয়েছিলো, কিন্তু কার্ডখানা তুলে নিল অনিন্দ্য।

—'আরে কমলাক্ষর কার্ড দেখছি। আবার কি চায় সে ?'

মণিমালা বললে—'এমনও হতে পারে যে কিছুই চান না তিনি, নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।'

ও আই সী। কমলাক্ষকেও নিমন্ত্রণ করেছ, একথা কই আমাকে তো বলনি।

ঠিকই। ভুল হয়ে গেছে। আগে তোমার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল।

কথাটা অনিন্দ্যকে ঈষৎ দংশন করলো, কিন্তু বাইরে তার কিছুই বোঝা গেল না। বেয়ারাকে বললে—বাবাকে নিয়ে এসো ভিতরে। এমনভাবে বললে, যেন সেই বাড়ীর কর্তা, এবং আগন্তুক তারই অতিথি।

এবারে অবশ্যি কমলাক্ষ আর রাস্তা পার হবার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করেনি। ফটকের দারোয়ানকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে গট গট করে হেঁটে চলে এসেছে ভিতরে, কিন্তু বারান্দায় উঠেই তার সাহস গেছে উবে, সে যে এখন নিমন্ত্রিত এবং সোজা ড্রইংরুমে ঢুকে যাওয়াই যে তার কর্তব্য একথা ভুলে গিয়ে দর্শনপ্রার্থীর মত কার্ড পাঠিয়েছে ভিতরে।

সে ঘরে ঢুকতেই অনিন্দ্য সোৎসাহে বলে উঠলো—এই যে এসো। সকালে তোমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতে পারলুম না। কেমন আছ ?

তোমাকে তো বেশ ভালোই দেখছি। মিস্ তলাপাত্র আশা করি আপনাদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটালুম না।

মণিমালা কিছু বলার আগে অনিন্দ্যই আবার বলে উঠল, তারপর কেমন আছো বলো। তুমি সেই ঠিক আগেকার মতোই আছো দেখছি। আর কি খবর ? বিয়ে করেছো ?

কমলাক্ষ বললে—হ্যাঁ, বিয়ে তো কবেই করেছি।

কন্‌গ্রাচুলেসন, বলে অনিন্দ্য উঠে গিয়ে কমলাক্ষের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলে।

মণিমালা তাড়াতাড়ি বললে—ডক্টর কর আমি অত্যন্ত দুঃখিত —আমি জানতুম না, নয় তো আজই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়েরও সৌভাগ্য হতো।

কমলাক্ষ বললে—আপনার চেয়ে ঢের বেশী দুঃখিত আমি। কেননা আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য আমারই এখনো পর্যন্ত হয়নি, এমন কি এখনো তাকে চোখে পর্যন্ত দেখিনি।

অনিন্দ্য আর মণিমালা দুজনেই হেসে উঠল।

বাঃ, কমলাক্ষ, তুমি তো শুধু ডাক্তারই নও দেখছি, কবিও বটে, বললে অনিন্দ্য।

হ্যাঁ, ভাবছি এবার ডাক্তারী ছেড়ে কবিতা লেখাই ধরবো।

অনিন্দ্য বললে—তার দরকার হবে না। আমার মনে হয়, তুমি অবিলম্বেই তলাপাত্র-ভবনের অন্যতম ফ্যামিলি ফিজিশিয়ন হয়ে যাবে।

ঈষৎ লাল হয়ে উঠলো কমলাক্ষর মুখ। তার মনের গহনে এরকম ইচ্ছা যে বরাবরই ছিল, অনিন্দ্য সেটা টের পাওয়াতে বিশেষ করে মণিমালার সামনে সেটা প্রকাশ করতে ভা ী অস্বস্তি বোধ করলো।

হঠাৎ অনিন্দ্যের দিকে তাকিয়ে মণিমালা বললে—কেন, একথা কেন মনে হয় তোমার?

অনিন্দ্য বললে—এ বিষয়ে আজই আমি তোমার জ্যাঠামশাইকে বলবো। আমার মনে হয়, আমি বললে তিনি সহজেই রাজি হবেন।

মণিমালা বললে—তোমার বন্ধুপ্রীতি তো অসাধারণ দেখছি।

অনিন্দ্য খুব সাধারণ ভাবে বললে—এ আর একটা বেশী কি। এত সহজে বন্ধু কোনো উপকার করতে পারলে কে না করে। কী বলো কমলাক্ষ? এই ধরো রাস্তায় যখন এ্যাক্সিডেন্ট হলো, কমলাক্ষ কি তোমাকে তার ডিস্পেনসারীতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করেনি। তাও তো তখন তোমাকে চিনতো না।

মণিমালা সোজা হয়ে বসে তীব্র চোখে অনিন্দ্যের দিকে তাকিয়ে বললে—আশা করি এর পরেই বলবে, যে আমাদের বাড়ী ডাক্তার হয়ে ঢোকবার মতলবেই তিনি সেদিন অতটা করছিলেন?

অনিন্দ্য গম্ভীর হয়ে নিয়ে বললে—একথা ওঠেই না। তাছাড়া কমলাক্ষর সামনে তোমার ও কথা বলা উচিত হয়নি।

এদিকে এদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে কমলাক্ষের কাণ ক্রমশই গরম হয়ে উঠেছিল। কথাগুলো প্রথম থেকেই কেমন যেন রেস্তুরো শোনাচ্ছিলো, মনে হচ্ছিল যেন এইসব কথার ভিতর দিয়ে নিজেদের কোনো বোঝাপড়া এরা করে নিচ্ছে। এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়ে বললো—কী আশ্চর্য! এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কথা কেন? সত্যই তো, এ বাড়ীর ডাক্তার হওয়া আমার পক্ষে দুরাশা। আর সেদিনের সেই ব্যাপার—সে কথা আর না তোলাই ভালো। ডাক্তার হিসাবে ওতো আমার কর্তব্য। অনিন্দ্য, এবার ক্যানসারের চিকিৎসা নিয়ে চমৎকার প্রবন্ধ বেরিয়েছে, দেখেছ নিশ্চয়ই?

ঠিক এই মুহূর্তে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা অনিন্দ্যের পক্ষে হয়তো সহজ হতো না, কিন্তু তলাপাত্র-ত্রয়ের আবির্ভাবে ঘরের আবহাওয়া গেলো বদলে। আজ সান্ধ্যভোজে কমলাক্ষকে নিমন্ত্রণ করবার অনুমতি মণিমালাকে তাঁরা দিয়েছিলেন, সকালের ব্যাপারটা যে একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে, তা শেষ পর্যন্ত তাঁরাও বুঝছিলেন। তাই বড় তলাপাত্র দাঁত বার করে বললেন—এই যে ডাক্তার কর—

মেজ তলাপাত্র ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন—কেমন আছেন?

ছোট তলাপাত্র চোখ মিট মিট করে বললেন—ভালো তো?

বলে তিনজনে মার্চ করে ড্রইংরুম পার হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু ভিতরের দরজার কাছে গিয়ে বড় তলাপাত্র হাঁক দিয়ে বললেন—ওহে অনিন্দ্য, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আর ছোট তলাপাত্র বললেন—মণি, একবার এদিকে শুনে যাস।

পরের মুহূর্তে ড্রইংরুম থেকে তারা অদৃশ্য।

মণিমালা এতক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে বসেছিলো। এইবার

অনিন্দ্যের দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি বসো এখানে, আমি দেখে আসি বাবা কেন ডাকাছেন। কমলাক্ষবাবু আপনি বন্ধুর সঙ্গে একটু গল্প করুন আমি এখুনি আসছি।

কমলাক্ষ মুচকি হেসে বললে—নিশ্চয়ই। আপনার সময়ের উপর হস্তক্ষেপ করি এমন সাহস কি আমার আছে।

মণিমালা চলে যেতেই কমলাক্ষ একটু নীচু গলায় বললে—আমার একটা উপকার করবে অনিন্দ্য ?

উপকার করলে অপমানিত বোধ করবে না তো আবার ?

কমলাক্ষ হেসে বললে—'আমার একটা অনুরোধ' যদি তুমি রাখ। সেই ঘড়িটি আমি তোমার হাতে ফিরিয়ে দিতে চাই, তুমি যথাস্থানে পৌঁছে দিও—নেবে ? বলে সে তার পকেট থেকে ক্ষুদ্র ঘড়িটি বার করলে।

অনিন্দ্য একটু বিরক্ত হয়েই বললে—তুমি দেখছি ঘড়ি ফেরত দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ।

কিছু মনে করো না অনিন্দ্য, ঘড়িটি ফিরিয়ে দিয়ে আমি মণিমালা দেবীকে অসম্মান করতে চাইনে। কিন্তু তুমি এটি তাঁকে দিয়ে বুঝিয়ে বলো, তাহলেই তিনি বুঝবেন।

অনিন্দ্য আরম্ভ করলো—না না, একী হতে পারে—

কিন্তু কমলাক্ষ একরকম জোর করেই তার হাতে গুজে দিয়ে বললে—এ বিষয়ে আর একটি কথাও না।

একটু পরে মণিমালা এসে জানালে যে ডিনার প্রস্তুত।

ডিনার কিন্তু বেশী জমলো না। তিন তলাপাত্র নিঃশব্দে প্রচুর খেলেন। আতিথেয়তায় কর্তব্য মণিমালা নিখুঁত ভাবেই করলে, কথাবার্তা একটু হলো দুই ডাক্তারের মধ্যেই। কমলাক্ষ বুঝতে পারলে তার উপস্থিতিতেই এরা সবাই যেন আরষ্ট। তাই আহারের পর নিছক ভদ্রতার খাতিরে যেটুকু সময় না থাকলেই নয়, সেটুকু সময়

থেকেই সে বিদায় নিলে। মণিমালা এলো তার সঙ্গে বারান্দা পর্যন্ত। এক সিঁড়ি নেমে বললে—বহু ধন্যবাদ।

কেন?

'সব কিছুর জন্যেই।'

আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে আশা করি।

ডাকলেই দেখা পাবেন।—নমস্কার—বলে কমলাক্ষ চলে গেতো।

অনিন্দ্য ড্রইংরুমের দরজার ধারে দাঁড়িয়েছিল, কথাগুলো সবই তার কানে গেলো। মণিমালা ফিরে আসতেই বললে—শুনলে তো! ও তোমাদের বাড়ীতে 'ডাক' চায়, অর্থাৎ কল। এর পরেও যদি ওকে তোমাদের বাড়ীর ডাক্তার করে না নাও, রীতিমত নিষ্ঠুরতা হবে।

অন্যকে করুণা করতে খুব ভালো লাগে না?

এটা করুণা নয়, কমন্‌সেন্স। ওর অবস্থায় হলে আমারও এই চেষ্টাই হতো। ওঃ! বাই দি ওয়ে, কমলাক্ষ তোমাকে এটা দিয়ে গেছে, বলে অনিন্দ্য তার পকেট থেকে ঘড়িটি বার করলে।

মণিমালা বললে—এর মানে?

ওটা আমার দেয়া উপহার, সুতরাং অন্য কাউকে দেবার তোমার অধিকার নেই।

ও তাই নাকি?—আর যে জিনিষ আমি দিয়েছিলুম, তুমি সেটা ফেরত নিলে কোন্ অধিকারে শুনি?

রাগ করছো কেন মণি, ঘড়িটা রাখো। একটা পুরনো স্মৃতিচিহ্ন হাতছাড়া করে লাভ কী? বরং কমলাক্ষকে তুমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দিও, সেটা ওর কাজে লাগবে। কত দিতে চাও? দুশো? পাঁচশো? হাজার? আমি যখন আছি, তখন টাকার ভাবনা তোমার নেই।

মণিমালার গলা চিরে তীব্র একটা স্বর বেরুলো—কী? কী

বললে? মনে রেখো, এখনো আমি তোমার সম্পত্তি হইনি। বলে সে অনিন্দ্যর হাত থেকে ঘড়িটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তলাপাত্র ভবনের প্রশস্ত বম্পাউণ্ডের কোথায় যে সেটি গিয়ে পড়লো—একটু শব্দ পর্যন্ত হলো না।

মিনিটখানেক কি আরো বেশী—অনিন্দ্য পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর চাপা গলায় বললে—ওয়েল! গুড নাইট! বলে সিড়ি দিয়ে নেমে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

* * *

অপমানিত হয়ে অনিন্দ্য চলে গেল, কিন্তু মণিমালা জানে অপমান সে করেনি। আজ বলে নয়, অনেক দিন থেকে আঘাত সইছে সে এ বাড়ীতে। ধনাঢ্য পরিবারে তার জন্ম, পিতা ও পিতৃব্যের অর্থ-লালসাটা সৎশিক্ষার পালিশে ঢাকা নেই, সে কারণে এ বাড়ীতে টাকা আছে প্রলোভন আছে, কিন্তু শোভন ভদ্র আচরণ নেই। আজ তার সেই দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অপরিসীম বিরক্তিটা সহসা প্রকাশ পেয়ে গেল অনিন্দ্যর সামনে। বিলাত থেকে ফিরলো অনিন্দ্য দু'বছর পরে আজ সকালে, কত আশা, কত মদির স্বপ্ন, কত মধুর স্মৃতি, কিন্তু প্রথম দিনের রাতেই সামান্য উপলক্ষ্যে ভুল বোঝাবুঝি—এ যেন ভাল একটা গল্পের প্লট কাঁচা লেখকের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। সমস্ত অহেতুক ঘটানাচক্রটা যেন তার টুটি চেপে ধরেছে।

চোখে অশ্রুর আভা দেখা দিতেই মণিমালার চমক ভাঙলো। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এবং তার মনের সকল প্রকার বিরক্তি ও উত্তেজনা দমন করে বাড়ীর উঠান তন্ন তন্ন করে খুঁজে হাতঘড়িটা আবার তুলে নিয়ে এলো। যুঁয়ের একটা চারা গাছের ওপর পড়ে সে কাঁচা মাটির জমিতে গড়িয়ে গিয়েছিল। ঘড়িটা ভাঙেনি, কেবল

দমবন্ধ হয়ে গেছে মাত্র, ভেঙে চুরমার হলেই হয়তো ভাল হতো। ঘড়িটা নিয়ে সে তখন ভারাক্রান্ত মনে অবসন্ন হয়ে উপরের সিঁড়িতে উঠছে এমন সময় কনিষ্ঠ তলাপাত্র সাগ্রহে এসে প্রশ্ন করলেন, অনিন্দ্য এত তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন রে? এতদিন বাদে ফিরলো, আমরা একটু গল্পগুজব শুনবো—মণিমালা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আমার মুখ থেকে শুনতে চান কেন বাবা—আপনারা তো তিনজনেই আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেন।

শোন মেয়ের কথা, তা কি কখনোও হয়? আরে কী বলে গেল—তাই বল না মা?

আপনারা গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসুন, আমি জানিনে—এই বলে মণিমালা দ্রুতপদে উঠে গেল। নীচের তলায় দাঁড়িয়ে মেজ তলাপাত্র অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বললে, শুনলে তো ভায়া তখনই বলেছিলুম মেয়েকে আদর দাও ক্ষতি নেই, কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়ো না। মাথাটি যে এবার বিগড়ে গেল।

ছোট তলাপাত্র বললেন, 'হু' ওই ডাক্তার ছোকরাই যত নষ্টের মূল।

বড় তলাপাত্র বললে—ভূত ছাড়িয়ে দাও যেমন করে হোক?

পরের দিন সকাল থেকে সমস্ত দিন মণিমালা নানা কাজে নানা অছিলায় অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু অনিন্দ্য এলো না। আজ তার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকার প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু আগেকার কথা মণিমালা ভোলেনি। একদা ওই ডাক্তার কমলাক্ষর মতই অনিন্দ্য এ বাড়ীতে ঢুকতো অতি সন্তর্পণে তারও লাঞ্ছনা হোতো ডাক্তারের মতন, কিন্তু মণিমালা দৈত্যপুরীর রাজকন্যার মত তাকে রক্ষা করে চলতো সকল দিকে। একদিন ছিল যখন ওই অনিন্দ্য তার হৃদয় অধিকারের জন্যে প্রাণ দিতে ও নিতে পারত। কিন্তু আজ বিলেতী হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে সাহেবী কৌশলে শুভরাত্রি জানিয়ে নাটকীয়

কায়দায় বিদায় নেয়, আজ অনিন্দ্য তার নাকের ওপরে দাঁড়িয়ে টাকা ছড়ায়। মণিমালার হৃদয়ের অবরুদ্ধ অভিমানী ফণিনীর ন্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

টেলিফোনটা কাছেই ছিলো, রিসিভারটা তুলে নিয়ে অনিন্দ্যের হোটেলে ডাকলো। আজ অন্তত জানা যাক তাদের দু'জনের সম্পর্কটা সত্যি সত্যি কী দাঁড়িয়েছে?

হ্যালো—কে? অনিন্দ্য আছেন? তুমি কে? বয়? ও। আচ্ছা অনিন্দ্যবাবুকে ডেকে দাও। নেই তিনি? কখন বেরিয়ে গেছেন? আচ্ছা মণিমালা রিসিভারটা রেখে দিয়ে একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। চাকরের কথাগুলো কাণে ছুঁচ যুটিয়ে দিল মেম সাহেবের সঙ্গে সন্ধ্যা-বেলায় বেরিয়ে যাওয়া। নিশ্চয় সিনেমায়। বিলেত থেকে ফিরে অনিন্দ্যের উন্নতি হয়েছে মনে হচ্ছে।

কিন্তু নারীর বিপদ এইখানেই শেষ নয়। বাড়ীর লোকেরা যদি জানতে পারে অনিন্দ্যের এই কাহিনী তবে তো তার অহঙ্কার করার আর কিছুই রইলো না, অসম্মানে তার মাথা হেঁট হয়ে থাকবে চিরদিন। একথা কে জানতো, পুরুষের স্তাবকতার পিছনে থাকে প্রতারণশীল মন, তাদের কাছে ব্যক্তি বড় নয়, বস্তুই বড়, মণিমালা আর মেম সাহেব সেখানে সমানই আদর পায়।

পরনের শাড়ীখানা যেমন তেমন করে জড়িয়ে মণিমালা বেরিয়ে এলো। সু পরবার অবকাশ নেই, শ্লিপার জোড়া পায়ে দিয়ে সে নীচে নেমে গেল। নীচে ভূষিমালের আড়তের লোকজনরা দিন-মজুরি নিয়ে কলরব সুরু করেছে। তার তাদের মাঝখানে তার মাননীয় জ্যাঠামশাই স্ফীতদেহটি নিয়ে দর কষাকষি করছেন। বেশ মানানসই হয়েছে। মণিমালা দরজা পার হতেই তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ মা সন্ধ্যাবেলায়।

মণিমালা বললে, আপনাদের বিলেত-ফেরতা ডাক্তারের কাছে।

'ওরে রামশরণ, দিদিমণিকে গাড়ী বের করে দে। বেশ, বেশ, সঙ্গে করে এনো অনিন্দ্যকে। বিয়ের আর পনেরো দিন বাকী ছেলের টিকিট দেখবার জো নেই।'

বিয়ের তারিখ শুনে মণিমালার বুকের ভিতরটা ছাৎ করে উঠলো, কিন্তু নিজেকে দমন করে বলল, 'গাড়ীর দরকার নেই জ্যাঠামশাই, তা গাড়ীতেই আমি ফিরে আসবো।—এই বলে সে হন্ হন্ করে বেরিয়ে বাড়ীর ফটক পার হয়ে পথে নেমে চলতে লাগলো। যত রাতেই হোক অনিন্দ্যর হোটেলেই সে অপেক্ষা করবে। আজ একথা তাকে জানিয়ে আসা চাই যে ভালবাসার চেয়ে বড় আত্মসম্মান। মহৎ শিক্ষা যার হয়নি, ভালবাসা তার কাছে ছেলেখেলার বস্তু, তুচ্ছ মান-অভিমানের হৃদয় বিলাস। মণিমালা দ্রুতবেগে চললো।

কিছুদূর গিয়ে কমলাক্ষর ডাক্তারখানা পার হতে হয়। নারীর চিরন্তন কৌতূহলবশতঃ মণিমালা চকিতে একবার সেদিকে লক্ষ্য করে ফের চললো। একবার যেন মনে হলো ছোট টেবিলটার ওপর মাথা গুঁজে বেচারী অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় খরিদ্দারের পথ চেয়ে রয়েছে। মণিমালা সহসা থমকে দাঁড়ালো, মন্দ কি? হাত ঘড়িটার খোঁটা দিয়ে ওকে একটু খুঁচিয়ে গেলে ক্ষতি কিছু নেই। মণিমালা ফিরে এসে পা টিপে টিপে ডাক্তারখানায় ঢুকলো।

পায়ের শব্দে কমলাক্ষের চমক ভাঙলো। মুখ তুলে সে চোখ রগড়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো। 'একি আপনি? বিশ্বাস হয় না যে।'

মুখ টিপে মণিমালা বললেন, 'ডাক্তারখানায় রোগী এসে উপস্থিত আর আপনার বিশ্বাস হয় না?'

কমলাক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কেমন করে হবে? শীতের আগেই যে বসন্ত এলো। আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য আমার। এই যে এখানে বসুন। দেহরক্ষী কেউ নেই সঙ্গে।'

'আজ্ঞে না।'—মণিমালা বললে, 'সোনার শিকল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছি।'

'বটে—কই, গলার আওয়াজে তো সেকথা মনে হয় না? মনে হচ্ছে দড়ি-দড়া বাঁধাই আছে, কেবল আলগা দিয়েছে মাত্র। আচ্ছা বলুন রোগটি কি?'

মণিমালা বললে, 'রোগটা? তার আগে দরজাটা একটু ভেজিয়ে দিন দৈত পুরীর গুপ্তচর এসে ধরে ফেলতে পারে'

'বেশ দিলুম। এইবার বলুন রোগের কাহিনী, আপনাকে তো মনে হচ্ছে না অসুখ?'

'ওমা, এই বুঝি আপনি ডাক্তার? এই জন্যে তো আপনাকে আমাদের ফ্যামিলির ডাক্তার করা হয়নি। চোখে যা দেখা যায় না সেইটেই তো সবচেয়ে কঠিন রোগ'

কমলাক্ষ হাসিমুখে বললে, 'তাহলে নিশ্চয়ই হৃদরোগ।' যদি তা হয়ে থাকে তবে তার ওষুধ আমার কাছে নেই। বরং আমার বন্ধুর কাছে যান।

তাই যাচ্ছিলুম ডাক্তার কর, তবে ফিরে এলুম আপনার কাছে একটা কথা জানতে।

কি বলুন।

'যে উপহার আমি শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দিয়েছিলুম তা আপনি এমন ভাবে ফেরৎ দিলেন কেন?'

'আমার তো উপহারের প্রত্যাশা ছিল না, তলাপাত্র। আপনার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হলো, আমি ফার্ষ্ট এড্ দিয়েছিলুম মাত্র, তার জন্যে উপহার চাইনি'

মণিমালা বললে, আপনি জানেন মেয়েরা সব সময় উপকারের প্রতিদান দিতে চায়।

সে জন্যে তাদের ধন্যবাদ মিস তলাপাত্র, আপনি যদি একটা ফুলের

তোড়া পাঠাতেন, বুঝতুম আপনার ঐশ্বর্য, কিন্তু ওই সোনার ঘড়ির সঙ্গে ছিল আমার প্রতি আর্থিক করুণা। ধনাঢ্য মেয়ে আপনি, ঘড়ি দিয়ে কৃতজ্ঞতা শোধ করেন।

মণিমালার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো কিন্তু মুখে এক ঝলক হাসি টেনে বললে, কাল আসবার সময় বলে এলেন বহু বহু ধন্যবাদ, যখনই ডাকবো তখনই যাবেন—আর আজ আপনার এই চেহারা আপনাদের স্বভাবে কি কোন সামঞ্জস্য নেই? কাল আপনার ভীরু প্রার্থনা দেখে ভেবেছিলুম পুরুষের এই দৈন্য কেন, আজ ভাবছি আপনারা বহুরূপী—আপনার উত্তেজনা দেখে হাসি পাচ্ছে।

কমলাক্ষ এবার হাসিমুখে বললে, এতবড় বীরপুরুষ আমি নই যে, মহিলা অতিথিকে নিজের কোটের মধ্যে পেয়ে বড় কথা শোনাবো। কিন্তু কি জানেন, সামঞ্জস্য আপনার পরিবারেই খুঁজে পাইনে। আপনার বাবা আর জ্যেঠারা আমাকে অপমান করলেন, কারণ চিকিৎসা করতে গিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁরা এত রক্ষণশীল, আবার ওদিকে বিলেত ফেরতা বড়লোকের ছেলের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের অবাধ মেলামেশায় আপত্তি নেই।

অবাধ নয়—ডাক্তারবাবু।

মাপ করবেন। বড়লোকের চালচলনই আলাদা। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা তিন বছর ধ'রে তরুণ যুবকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব টেনে বেড়ায় না—না না, আপনাকে দোষী বলছিনে, বন্ধুত্বে অপরাধের কিছু নেই, আমি বলছি ওই রক্ষণশীল মতামতের তলাকার দুর্নীতির কথা।

মণিমালা বললে, আমার বাড়ীর নিন্দে শোনার জন্য এখানে আসিনি ডাক্তারবাবু।

কমলাক্ষ বললে, তা জানি মণিমালা দেবী। জেনেছি আমি সব, ঘণ্টাতিনেক আগে অনিন্দ্য আমাকে ফোন করেছিল। আমি সব শুনেছি।

সচকিত হয়ে মণিমালা বললে, কী শুনেছেন? অনিন্দ্য কোথায়? সে কোথায় আপনি নিজেই জানেন।

মণিমালার মাথা হেঁট হোলো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো, এখন দেখছি সমস্ত গণ্ডগোল আপনাকে ওই উপহারটি দেওয়ার জন্য। টাকা দিলেই ভাল করতুম।

কমলাক্ষের কণ্ঠে উত্তাপ ফুটে উঠলো। বললে, আমার তীব্র ভাষার জন্যে আমাকে মার্জনা করবেন। অর্থের অহংকার আপনার গুরুজনেরা অহেতুক আমায় অপমান করলেন, কিন্তু তাদের চেয়ে আমার অহঙ্কার অনেক বড—তাই আমি সেই অপমান সহ্য করেছি। আপনি যদি টাকা পাঠাতেন খুশি হতুম, বুঝতুম আপনার পরিচ্ছন্ন হৃদয়বৃত্তি, কিন্তু দিলেন হাতঘড়ি, হৃদয়ের সুর মাখিয়ে। কেন? কেন দরিদ্র ডাক্তারের প্রতি আপনার এই প্রতারণা, মিস তলাপাত্র?

শুষ্ক কণ্ঠে মণিমালা বললে, প্রতারণা? আপনাকে আমি—

নিশ্চয়ই। শিক্ষিতা মেয়ে আপনি, তবু বুঝতে পারেননি, প্রতারণা করলেন নিজের সঙ্গে, প্রতারণা করেছেন আমার সঙ্গে—

মণিমালা উঠে দাঁড়ালো। নীচের ঠোঁটখানা উল্টে তীব্র বিদ্রূপের কণ্ঠে বললে, আপনার এই চিত্তক্ষোভের রহস্য বড্ড ধরা পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা নমস্কার।

দাঁড়ান।—বলে কমলাক্ষ এসে দরজা আগলে দাঁড়ালো। পুনরায় বললো, নিজের বাড়ীতে আপনি রাজকন্যা হতে পারেন, এখানে সামান্য অতিথি। এই বেয়ারা চা আর নিমকি নিয়ে আয়। হ্যাঁ বসুন। কাল দাত পর্যন্ত মেয়েদের পায়ে ধরা তরুণ যুবক ছিলুম, আজ আমি হঠাৎ প্রবীণ! কি জানেন মিস তলাপাত্র—

মণিমালা বললে, জানতে আমি চাইনি, আপনি চুপ করুন।

তা হলে শুনে রাখুন, গত তিন বছরের মধ্যেও আপনাদের সম্পর্ক সত্য হয়ে ওঠেনি। এখনো সংশয়, এখনো দ্বন্দ্ব। একে

ভালবাসা বলবেন ? এ কিছু না। সামান্য অভিমানের বাতাস লাগলে যে ঘর ভাঙে সেটা তাসেরঘর, চোরাবালির উপর সে দাঁড়িয়ে। বুঝলেন মিস তলাপাত্র, যেখানে অন্তরের মিল নেই, সেখানেই অশ্রদ্ধা ভালবাসার ক্ষেত্রে যেখানে পদে পদে ভুল বোঝাবুঝি, সেখানেই বুঝতে হবে—

দরজার বাইরে কড়ার শব্দ হলো। কমলাক্ষ সচকিত হয়ে বললে—বোধহয় কোন রোগী এসেছে আপনি একটু প্রাইভেট চেম্বারে যান।

মণিমালা উঠে দাঁড়ালো। ইলেকট্রিকের আলোয় তার চোখের জল গোপন রইলো না। অন্য ঘরে যেতেই কমলাক্ষ গিয়ে দরজা খুললো। তারপর সবিস্ময়ে বললে, আরে অনিন্দ্য যে—এসো এসো, এসব কী তোমার পাগলামী বলো ত ?

চেয়ারখানা টেনে নিয়ে শান্ত হয়ে বসে পড়ে অনিন্দ্য বললে, না ভাই, কোন অনুরোধ করো না। সীট রিজার্ভ করেছি। পরের প্লেনেই আমি বিলেত যাব।

কি বলছো তুমি অনিন্দ্য, তুমি বিলেত যাবে ?

কমলাক্ষ হো হো করে হাসতে লাগলো।

অনিন্দ্য বললে : পাগলের মত হাসছো কেন ? এতে তো হাসবার কিছুই নেই।

কমলাক্ষ বললে : তোমার কাছে না থাকতে পারে, তুমি বড়লোক আমরা গরীব, শ্যামবাজার থেকে চৌরঙ্গী যেতে হলে আমাদের তিনবার ভাবতে হয়। সেই জন্যেই হাসছি।

আমি আবার বিলেত যাচ্ছি শুনে তোমার খুব আনন্দ হলো না ?

তা একটুখানি হলো বই-কি। এবার যখন ফিরবে, দেখবো সঙ্গে এনেছ চমৎকার টুকটুকে একটি মেমসাহেব। খবর দিও—আমরা ষ্টেশনে গিয়ে তোমাদের অভিনন্দন দিয়ে নিয়ে আসবো।

অনিন্দ্য বললে : কেন, মেমসাহেব বিয়ে করব কোন দুঃখে ?

যে দুঃখে মিস মণিমালাকে তোমার ভালো লাগলো না।

অনিন্দ্য জিজ্ঞাসা করলে : মণিমালাকে আমার ভালো লাগলো না তা তুমি বুঝলে কেমন করে ?

কমলাক্ষ বললে : টাকা আমার নেই সত্যি, কিন্তু এটুকু বোঝবার মত বুদ্ধিও আমার নেই—তাই বা তুমি ধারণা করলে কেমন করে ?

অনিন্দ্য বললে : বুদ্ধি তোমার নিশ্চয়ই আছে কমলাক্ষ, নইলে মণিমালার হৃদয় তুমি জয় করতে পারতে না।

কমলাক্ষ হো হো করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললে : আমি ? জয় করেছি ? মণিমালার হৃদয় ?

হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। বলতে বলতে অনিন্দ্যর কণ্ঠস্বর এবং মুখের চেহারা দুই-ই গেল বদলে। অত্যন্ত রুক্ষ কণ্ঠে বললে : সেই কথাই বলবার জন্যে আমি এলাম তোমাদের এখানে। মণিমালাকে বোলো—এতে আমার কোনও দুঃখ কোনও ক্ষতি—

হঠাৎ ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হয়ে গেল। অনিন্দ্যর মুখের কথা রইলো তার মুখে আটকে ; পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো মণিমালা। বললে : যত দুঃখ, যত ক্ষতি বুঝি আমার ?

এই কথাটা বলে আর সে জবাবের অপেক্ষা করলে না। হন্ হন্ করে দরজা দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল বাইরে।

কমলাক্ষ চীৎকার করে তাকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু নাম ধরে না, কি বলে তাকে ডাকবে কিছু বুঝতে না পেরে কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়ে অনিন্দ্যের মুখের পানে অপ্রস্তুতের মত তাকালে।

অনিন্দ্যর মুখখানা তখন সে কি রকম হয়ে গেছে, সে কথা বর্ণনা করে বোঝানো শক্ত। বললে, এখনও কি বলতে চাও আমি ভুল বুঝেছি কমলাক্ষ ?

কমলাক্ষ কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় বেয়ারা এলো দু পেয়ালা চা আর দু'প্লেট খাবার নিয়ে।

অনিন্দ্য একবার সেই দিকে তাকিয়ে দেখলে। বললে: হুঁ, হু বলবার অর্থ—আমি সবই বুঝেছি।

কমলাক্ষ বললে: রাগ করো না অনিন্দ্য, চা খাও।

অনিন্দ্য উঠে দাঁড়ালো। বললে: আমার জন্যে তো আনাওনি। যার জন্যে আনিয়েছ সে তো চলে গেছে।

এই বলে নিজেও দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

কমলাক্ষ আবার বললে: তোমার কি কিছুই আর জিজ্ঞাসা করবার নেই অনিন্দ্য?

অনিন্দ্য বললে: আছে।—কতদিন ধরে তোমাদের এই লুকোচুরি চলছে শুনি?

কমলাক্ষ বললে: আমার কথা যদি বিশ্বাস কর ত বলি।

অনিন্দ্য তখন রাস্তায় নেমে পড়েছে। বললে: থাক, মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলবার অপরাধ থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম।

অনিন্দ্যের ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। তাতে চড়ে ড্রাইভারকে বললে: চল?

গাড়ী ছাড়তে যেটুকু সময় লাগলো, সেই সময়ের মধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনিন্দ্য শুধু বলে গেল: এতে তোমার দুঃখিত হবার কিছু নেই কমলাক্ষ। আমি শুধু দুঃখ পেলাম তোমরা দু'জনেই আমার সঙ্গে চমৎকার অভিনয় করলে বলে।

অনিন্দ্যর প্রত্যেকটি কথা কমলাক্ষের কাণে এলো, গাড়ীটাও চোখের সুমুখ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুলো না, কাঠের মত শক্ত হয়ে সে তার ডাক্তারখানার দরজায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

* * *

তিন তলাপাত্রের তখন নিদারুণ অবস্থা। বিয়েতে অনিন্দ্যকে কি কি দেওয়া হবে তার ফর্দ হয়ে গেছে, শুধু গোলমাল বেধেছে কি রকম ঘড়ি তাকে দেওয়া হবে—তাই নিয়ে! আলোচনা চলেছে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে। তিনজনের মোটা শরীর ঘেমে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে গেছে, কিন্তু কিছুতেই তারা এর মীমাংসা করতে পারছে না।

ছোট তলাপাত্রের হঠাৎ মনে হলো—এই ঘড়ি দেওয়া না দেওয়ার মীমাংসা তো মণিই করে দিতে পারে। মণিকে জিজ্ঞাসা করা যাক্। —বললে : দাদা, মণিমালাকে জিজ্ঞাসা করে আসি। সাহেব সুবোর দোকানের খবর ও ঠিক বলতে পারবে!

বড় বললে : মণি গেছে অনিন্দ্যের হোটেলে।

একটা চাকর ঘরের কোণে বসে প্রকাণ্ড বড় একটা কলকেয় ফুঁ দিচ্ছিল। বললে : দিদিমণি ফিরে এসেছেন আমি দেখেছি।

ছোট বললে : ডাক ওকে।

মেজ বললে। ডাকতে হবে না, আমরাই যাচ্ছি।

তিনজনেই উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় গদির টেলিফোনের রিং বেজে উঠলো।

বড় তলাপাত্র রিসিভার তুলে ধরলে।

হ্যালো। কে?

নামটা শুনে চোখ দুটো তার বড় বড় হয়ে উঠলো। ভাইদের জানালে—অনিন্দ্য ডাকছে। বললে : বলব? ঘড়ির কথাটা বলবো অনিন্দ্যকে।

মেজ বললে : বল না।

বড় বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অনিন্দ্য বললে, শুনুন। বিয়ে বন্ধ করে দিন। মণিমালাকে আমি বিয়ে করব না।

এঁ্যা? বলে বড় তলাপাত্র থপ করে সেইখানেই বসে পড়ল। বললে: সে কি? কেন?

মেজ ও ছোট দুজনেই এগিয়ে এল—খবরটা জানবার জন্যে।

রিসিভারটা মেজ'র হাতে তুলে দিয়ে বড় বললে: শোন। বলছে বিয়ে করব না।

মেজ শুনলে অনিন্দ্য বলছে: কমলাক্ষের সঙ্গে বিয়ে দিন।

মেজ বললে—কি বললে? কমলাক্ষ? সেই ডাক্তারটা?

হ্যাঁ।

কেন? কেন? কি হয়েছে অনিন্দ্য?

অনিন্দ' তখন টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছে।

তিনজনেই তৎক্ষণাৎ ছুটল মণিমালার ঘরের দিকে।

মণিমালার ঘরের দরজা বন্ধ।

তিনজনেই দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল প্রাণপণে, ডাকাডাকিরও অন্ত রইল না, কিন্তু দরজা কিছুতেই খুলল না। ভেতর থেকে সাড়াও পাওয়া গেল না।

সর্বনাশ!

ছোট বললে: দরজাটা ভেঙে ফেলব দাদা?

মেজ বললে: দাঁড়া দেখি আগে।

এই বলে সে ওদিকের বারান্দায় গিয়ে বন্ধ জানালার গায়ে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। হঠাৎ একটা ছিদ্রের পথে দেখা গেল—বিছানার ওপর উপুর হয়ে শুয়ে শুয়ে মণিমালা কাঁদছে আর একটা কাগজের ওপর কি যেন লিখছে।

বড় ও ছোট দুজনেই এসে দাঁড়াল। উঁচু জানালার দুটো শিখ দুহাতে চেপে ধরে মেজ তলাপাত্র ঝুলছে।

ছোটর উদ্বেগটাই সব চেয়ে বেশি [illegible]য়েছিল। হাজার হোক, নিজের মেয়ে। সেই আগে জিজ্ঞাসা করলে[illegible] কিছু দেখতে পাচ্ছিস?

মেজ থপ করে জানালা থেকে নামল। চুপি চুপি বললেঃ কাঁদছে।

বড় বললেঃ কাঁদছে?

হ্যাঁ কাঁদছে আর কি যেন লিখছে?

ছোট বললেঃ কি লিখছে?

মেজ বললেঃ তুই ভারি বোকা তো? কি লিখছে তা আমি এখান থেকে বুঝব কেমন করে?

তাও তো বটে ছোট বললেঃ ও।

কিন্তু এমনি করেই তো শুনেছি মেয়েগুলো রাগ করে চিঠি লিখে আত্মহত্যা করে।

বড় বললে, তাহলে তুই আবার ওঠ মেজ আমরা বর' তোকে তুলে ধরছি।

এই বলে বড় তাব কোমর ধরে জানালার ওপর তোলবার চেষ্টা করলে. কিন্তু মেজ বললেঃ না দাদা, ভারি বেকায়দা হচ্ছে। এবার বরং তুমি ওঠা।

বড বললেঃ আমি? আমার পায়ে বাত—

এই বলে সে ইতস্তত করছিল, মেজ বললেঃ তাহলে একজন চাকরকে—

ছোট তাকে কথাটা শেষ কবতে দিলে না। বললেঃ তুমি ভারি বোকা মেজদা, বাড়ীর কেলেঙ্কারীর চাকরের কাছে—

তাও তো বটে। মেজ এতক্ষণে বুঝলে কথাটা বলা তার ভারি অন্যায় হয়েছে। এবং এই অন্যায়ের প্রতিকার স্বরূপ সে রাজি হলো আর একবার জানালায় বসে ঝুলতে।

দু'জনে ধরাধরি করে মেজকে দিলে তুলে। মেজ ঝুলছে। ছোটর মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললে—বড়দা, এই সময় তাড়াতাড়ি সেই ব্যাটা ডাক্তারের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। মেজদা

এইখানে মণিমালাকে আগলে থাক, আমরা দুজনে চল—যাই একবার গাড়ীটা নিয়ে।

বড় বললে—সেই ভাল। আয়। তুই থাক মেজ।

মেজ ভারি বিপদে পড়ল। বড় ও ছোটর দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকালে, তারপর বললে—তাই যাও তোমরা, কিন্তু ফিরো তাড়াতাড়ি।

বড় ও ছোট চলে গেল। তিনজনের জোট ভাঙ্গলো জীবনে, এই বুঝি প্রথম, তা হোক বিপদের দিনে সবই সম্ভব।

বড় গাড়ীটা মণিমালার এ্যাক্সিডেণ্টের পর গ্যারেজে গেছে, এখনও ফেরেনি। কাজেই ছোট ফোর্ড গাড়ীটা নিয়েই তাঁদের বেরুতে হলো। চন্দন সিং দারোয়ানকে বললে—লম্বা লাঠিটা নিয়ে তুই ওঠ গাড়ীতে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাব?

ছোট বললে—আগে ওই ব্যাটা ডাক্তারের ডাক্তারখানায় চল।

ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিল।

ড্রাইভারের সৌভাগ্য, কমলাক্ষর ডাক্তারখানা খোলাই ছিল।

ছোট বললে—দাঁড়াও।

গাড়ী দাঁড়ালো।

বড় ও ছোট গাড়ি থেকে নেমে পাশাপাশি দুজনে ঢুকলে ডাক্তার-খানার ভেতরে। পেছনে পেছনে এলো লাঠি হাতে চন্দন সিং।

কমলাক্ষ মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসে ছিল চেয়ারের ওপর। মনে হলো কি যেন ভাবছে।

অকস্মাৎ পায়ের শব্দে মুখ তুলেই দেখে, তলাপাত্র ভ্রাতৃদ্বয় একেবারে তার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

কমলাক্ষ জিজ্ঞাসা করলে—কি চান?

বড় বললে—তোমাকে আসতে হবে।

কোথায়?

ছোট বললে—আমাদের সঙ্গে।

কেন ?

বড় বললে—কেন তা এখানে বলব না।

কোথায় বলবেন ?

ছোট বললে—থানায়।

কমলাক্ষ একটুখানি চমকে উঠলো। যত না চমকালো এদের কথা শুনে, তত বেশী চমকালো পেছনের চাপরাশীটাকে দেখে। বড় লোক। হয়তো বা কিছু একটা কাণ্ড করে বসেছে।

বললে—থানায় আমি যাব না। থানায় যেতে হলে পুলিশের পরোয়ানা চাই।

কথাটা সে মিথ্যে বলেনি।

বড় বললে—তা বেশ, তাহলে এইখানেই বলা যাক্, না কি বল ছোট ?

তাহলে শোন। বলতে বলতে বসলো একটা চেয়ারের ওপর। বললে—মণির সঙ্গে—

ছোট তাকে থামিয়ে দিল। বললে—থামো দাদা।

তার বোধকরি সম্মানে বাধলো। চন্দন সিং পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তার।

ছোটর জেরা শুরু হলো কমলাক্ষের সঙ্গে।

অনিন্দ্যর সঙ্গে তোমার কি হয়েছে ?

কমলাক্ষ বললে—কিছু হয়নি।

মণিমালার সঙ্গে ?

তাকেই জিজ্ঞাসা করুন গিয়ে। আমায় কেন ?

তোমাকে বলতে হবে।

বলব না।

বলবে না ?

কমলাক্ষর মনের অবস্থা খুব খারাপ। চিৎকার করে বলে উঠলো—না। না। না।

বড় চমকে উঠলো। ছোট বললে—এ তো ভারী বেয়াড়া লোক দাদা?

বড় বললে—তাহলে চল।

এই বলে দুই ভাই আগে পিছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে বীর বিক্রমে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

দু'জনেই গাড়ীতে উঠলো? কারও মুখে কোন কথা নেই।

চন্দন সিং গাড়ীতে উঠবার জন্যে গাড়ীর দরজাটা যেই খুলেছে, বড় চিৎকার করে উঠল—কোন কাজের নয় হতভাগা, ভাগ!

চন্দন সিং অবাক!

তবে সে তার মণিবদের চেনে। কেমন করে তাদের খুশী করতে হয় জানে? তৎক্ষণাৎ লম্বা একটা সেলাম করে বললে—হুকুম করুন, হুজুর, ব্যাটার মাথাটি কাটিয়ে লিয়ে আসি।

বড় বললে—না থাক। তুই বাড়ী যা।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে—বাড়ী ফিরব?

ছোট বললে—না। ডাণ্ডি হোটেলে।

ডাণ্ডি হোটেলের দিকে গাড়ী চললো।

প্রায় মিনিট দশেক চলার পর গাড়ী দাঁড়াল হোটেলের দরজায়। প্রকাণ্ড না হলেও হোটেলটা নেহাৎ ছোট নয়।

দুই তলাপাত্র গিয়ে হাজির হলো লিফটের কাছে, কিন্তু লিফট গেছে খারাপ হয়ে। কাজেই অতি কষ্টে প্রকাণ্ড সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁফাতে হাঁফাতে যেমনি তারা দোতলার বারান্দায় গিয়ে পৌঁচেছে, পাগড়ী পরা একজন বেয়ারা সেলাম ক'রে কাছে এসে দাঁড়াল।

ছোট বললে—অনিন্দ্যবাবু কোথায় থাকেন?

বেয়ারা বুঝতেই পারলে না।—অনিন্দ্য? সে আবার কি রকম নাম? ও নামে কেউ এখানে নেই।

নেই কি রকম?

বড় চাইল ছোটর পানে, ছোট চাইল বড়র পানে।

এইটাই ডাণ্ডি হোটেল তো?

বেয়ারা বললে—জী হাঁ।

ছোট বললে—এখুনি টেলিফোন করেছে এইখান থেকে। নিশ্চয় আছে। তুমি তাহলে চেনো না।

চেনে না? এতবড় কলঙ্ক বেয়ারার নামে?

বেয়ারা তাদের সঙ্গে নিয়ে দেখাতে লাগল—ভস সা'বের কামরা, সেন-সাবের কামরা, গুপটা সা'বের কামরা, আয়েঙ্গার সা'ব আর তার মেমসা'ব থাকে এই কামরায়—

কথাটা তার শেষ হলো না। একজন উড়িয়া বেয়ারা বেরুচ্ছিল পাশের ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা করলে—কাকে চাই?

বড় বললে—অনিন্দ্যবাবুকে।

বেয়ারা বললে—তালুকদার সাহেব এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ ঠিক। বেয়ারা ঠিকই বলেছে। অনিন্দ্য তালুকদারই তো বটে।

তবে? বলে ছোট এমন ভাবে তাকাল সেই আগেকার বেয়ারাটার দিকে দেখে মনে হলো যেন সে ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে তাকে ভস্ম করে ফেলতে পারে।

বেয়ারা বললে—আপ, তো দুসরা নাম বাতায়া থা।

বেয়ারা বললে—দোসরাই হোক আর তেসরাই হোক, খুব হয়রাণ করেছ বাবা, আমরা এখন বসব, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

উড়ে বেয়ারা ঘর খুলে দিলে। বললে—বসুন।

শীতকালে। তবু দুজনেই তখন ঘর্মাক্ত কলেবর। একটুখানি বসতে পেয়ে দুজনেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

বড় বললে—এক গ্লাস জল দাও বাবা।

বেয়ারা জল নিয়ে এলো।

বড় জল খেয়ে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার বাবু কখন আসবে ?

বেয়ারা বললে—তালুকদার সাহেব ?

ছোট বললে—হ্যাঁ।

বেয়াবা বললে—তা জানি না।

এ অবস্থায় আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়। এখন হয়ত সে নাও আসতে পারে।

ছোট চাইলে বড়র মুখের দিকে। বড় চাইলে ছোটর মুখের দিকে

বড় বললে—চল্।

ছোট বললে—চলো।

বেয়ারা খুশী হলো। কারণ বাবুদের বসিয়ে রেখে সে বাইরে যেতে পারে না। অথচ, সাহেব একখানা চিঠি রেখে গেছেন ডাকে দেবার জন্যে। জরুরী চিঠি।

তাদের পিছু পিছু বেয়ারা যাচ্ছিল চিঠিখানা হাতে নিয়ে। ছোটর হঠাৎ কি কৌতূহল হলো, বললে—দেখি চিঠিখানা।

এই বলে চিঠিখানা একরকম সে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দেখলো—খামের চিঠি, ওপরে মণিমালার নাম লেখা।

ছোট চীৎকার করে উঠলো—দাদা, মণিমালার চিঠি।

বড়ও দেখলে। দেখে বললে—এ আমাদেরই চিঠি। আমরাই নিয়ে যাই। তোমাকে আর যেতে হবে না ডাকঘরে।

বেয়ারা বললে—আজ্ঞে না, তা দিতে পারব না।

ছোট বললে—বা-রে! আমি মণিমালার বাবা।

বড় বললে—আমি জ্যেঠামশাই।

বেয়ারা বললে—তা হোক। সাহেব রাগ করবে।

রাগ করবে! আমরা বলছি রাগ করবে না। তুমি দাও।

বেয়ারা বললে—আজ্ঞে না। আপনারা কে, তা আমি কেমন করে জানবো?

অমনি করে তারা যখন মণিমালার বাবা ও জ্যেঠা প্রমাণ করবার জন্যে ভয়ানক চীৎকার শুরু করেছে, এমন সময় বারান্দায় এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে! পেছনে একজন বেয়ারার হাতে মোটা মোটা দুটো সুটকেশ, একজনের মাথায় প্রকাণ্ড হোল্ড্ অল্। গোলমাল শুনে মেয়েটি একটু পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

একজন বেয়ারা ছুটে এসে অনিন্দ্যর খানসামাকে খবর দিলে মেয়েটি তালুকদার-সাহেবকে চায়। উড়ে খানসামাটা চিঠি কাড়া-কাড়ির গোলমাল থেকে বেঁচে গেল! খামের চিঠিখানা সে ছোট তলাপাত্রের হাত থেকে এক রকম কেড়ে নিয়েই দিলে—ছুট!

বড় ও ছোট অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেই দিকে চেয়ে।

তারপর কি আর করবে, আবার তেমনি সিঁড়ি ভেঙে তারা নীচে নেমে এলো।

এতক্ষণ তাঁরা একটি কথাও কয়নি। গাড়ীতে উঠে আবার দু'জনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে কথা কইলে।

ছোট বললে—মেয়েটিকে দেখলে দাদা।

বড় বললে—ভাল করে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, দেখলাম।

ছোট বললে— অনিন্দ্যর কাছে এলো।

বড় বললে—হুঁ। একে নিয়েই মণিমালার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হলো না তো?

ছোট বললে—উঁহু। মালপত্র দেখলে না? মনে হলো মেয়েটি বাইরে থেকে এলো।

বড় কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বার কতক বেশ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—নাঃ, ঝকমারি ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল দেখছি। এই জন্যেই বলছিলাম মেয়েটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে কাজ নেই। আমরা হলুম গিয়ে জাত তিলি, আমাদের ধাতে ও-সব সইবে কেন?

ছোট বোধ হয় গেল রেগে। বললে—তুমি দাদা ভারী মিথ্যাবাদী। তুমিই তো তখন বললে আমাদের বংশে ওই একটি মাত্তর মেয়ে, ওকে আচ্ছা করে লেখাপড়া শেখানো যাক।

বড় বললে—আমি বলে ছিলুম না, মেজ বলেছিল?

ছোট বললে—তা সে যেই বলুক! ধরো—আমিই না হয় বলেছিলাম, কিন্তু এবার কি হবে?

বড় বললে—হবে আবার কি! বিয়ে দেবো না?

ছোট বললে—ঠিক বলেছ দাদা। আমাদের মেয়ে আমরা যা ইচ্ছে তাই করব।

বড় খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলে। ভেবে বললে—মণিমালা যা বলবে তাই হবে।

ছোটও এতক্ষণ ভাবছিল। বললে—মেয়ে যদি ওই ব্যাটা ডাক্তারকে বিয়ে করতে চায়?

কমলাক্ষর ওপর বড়র রাগ বোধ হয় সব চেয়ে বেশী। তবু সে বোধ করি আর কিছু ভাবতে না পেরে চীৎকার করে বলে উঠল—তাই দেবো!

ড্রাইভারটা ভাবলে বুঝি বাবু বললেন—ডাইনে। টপ করে সে ডান দিকের গলির ভিতর গাড়ীখানা ঢুকিয়ে ফেলল।

ছোট তৎক্ষণাৎ তার মাথায় মারলে এক চাঁটি।—তোমাকে এদিকে গাড়ী ফেরাতে কে বললে স্টুপিড?

বেচারা তখন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে। বললে, বড়বাবু।

বড় বললে—বাড়ী গিয়ে ব্যাটাকে তাড়িয়ে দে।

ছোট বললে—ব্যাটা বোকার একশেষ। এতটুকু বুদ্ধি নেই।

গাড়ীটা অতি কষ্টে ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি তারা যখন বাড়ী ফিরলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে! পথে আলো জ্বলছে।

বড় ও ছোট গাড়ী থেকে নেমেই ছুটল দোতলায় মণিমালার ঘরের দিকে। গিয়ে দেখলে, মণিমালার ঘরের দরজা খোলা মণিমালা নেই।

মেজকে রেখে গিয়েছিল পাহারায়। বড় ও ছোট তৎক্ষণাৎ মেজর সন্ধানে বারান্দা ঘুরে পেছনের দিকে গিয়ে দেখে জানালার ঠিক নীচেই রেলিং-এর ধারে ঠাণ্ডা মার্বেলের ওপর মেজ দিব্যি নিশ্চিন্তে শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

বড় তাকে এক ঠেলা দিয়ে বললে—ওঠ।

মেজ ধড়পড় করে উঠে বসলো। ঘুমের ঘোরেই বললে—কে?

ছোট তাড়াতাড়ি বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিলে!

চোখ রগড়ে মেজ বললে—ও তোমরা।

ছোট বললে—হ্যাঁ আমরা। মণি কোথায়?

মেজ নির্বিকার চিত্তে বললে—কেন? ঘরে।

ঘরে নেই?

নেই? বলে মেজ উঠে দাঁড়াল। বললে—নিশ্চয়ই আছে? আমি তাকে দেখেছি।

বড় বললে—দেখেছি তো আমরাও। কিন্তু তুমি ঘুমিয়েছ কতক্ষণ?

মেজ একটু লজ্জিত হলো। মাথা হেঁট করে বললে—যা মশা দাদা পটাপট করে কামড়াচ্ছিল, জানালার শিক ধরে আর কতক্ষণ ঝুলবো। জানি তো মণি ঘরেই আছে তাই একটু শুয়ে—

কথাটা বড় তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে—শুয়ে তুমি আরাম করছিলে আর মণি ছাখ গিয়ে পালিয়ে গেছে।

তিন-ভাইএ বাড়ীটা একেবারে তোলপাড় ক'রে তুলল।

চাকরগুলো ধমক খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে গেল। দেউড়ির দারোয়ানটাও ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

কিন্তু তাদের দোষ কি? তারা কিছু জানে না। জানলে নিশ্চয়ই বারণ করতো।

মেজ বললে—এই জন্যেই তো বলেছিলাম—আমি একজন চাকরকে—

ধেৎ! বলে প্রচণ্ড এব ধমক দিয়ে বড় নেমে এলো নীচে। পিছনে পিছনে মেজ এলো। ছোট এলো।

ছোট বললে—থানায় খবর দেওয়া যাক দাদা।

এই বলে সে টেলিফোনে ডাকতে যাচ্ছিল থানার দারোগাকে।

মেজ বললে—টেলিফোনে এসব ব্যাপারে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলা উচিত নয় ছোট।

বড় বললে—হ্যাঁ নিজেদের যাওয়া উচিত। চল।

গ্যারেজে নিয়ে যাবার হুকুম না পেয়ে গাড়ী তখনও দরজাতেই দাঁড়িয়েছিল। তিনজনেই গিয়ে গাড়ীতে উঠলো।

থানা বেশী দূর নয়। পাড়ার বড়লোক। থানার দারোগাবাবু থেকে আরম্ভ করে ছোট কনষ্টবলটি পর্যন্ত বিশেষ পরিচিত। তৎক্ষণাৎ মহাসমাদরে তাদের বসতে বলা হলো। সকলেই প্রশ্ন করতে লাগলো—কি ব্যাপার? তলাপাত্র তিন-ভাই এমন অসময়ে নিজেরা থানায় এসেছেন শুনে দারোগাবাবু ছুটে এলেন। এসেই নমস্কার ক'রে বললে—কি খবর বলুন দেখি? কিছু বিপদ-আপদ—

তিনভাই একসঙ্গে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলে। হাতের ইসারায় অন্য দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বড় বলল—তোরা সব থাম আমি বলব।—

ছোট ঘাড় নাড়লে।

মেজ বললে—হ্যাঁ, তুমিই বল।

বড় বললে—একটা ডাইরী—লিখুন—আমাদের মণিমালা রাগ ক'রে বাড়ী থেকে চলে গেছে।

দারোগাবাবু এঁদের তিনটি ভাইকেই বেশ ভালোভাবে চেনেন। মনে মনেই একটুখানি হাসলেন। হেসে বললেন—সর্বনাশ! বলেন কি। রাগ করে চলে গেছে বাড়ী থেকে?

মেজ ও ছোট কি যেন বলতে গিয়েও পারলে না কথা বলা তাদের বারণ।

বড় বললে—'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাগ করে।'

খাতা-পেন্সিল নিয়ে দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কটার সময়?

বড় বললে—'তা আন্দাজ—'

বলেই মেজ ও ছোটর মুখের পানে তাকালে।

মুখ দেখে মনে হলো কেউ তা জানে না।

বড় বললে—লিখুন, সন্ধ্যে ছটা নাগাদ।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—রাগের কারণ?

বড় বললে—তাও লিখতে হবে নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কারণ লিখতে হবে বই কি! হঠাৎ যদি, এই ধরুন—ভগবান না করুন, আত্মহত্যা-টত্যা করে বসে, তাহলে তাকে ধরতে হবে।

কাকে? যার ওপর রাগ করে গেছে, তাকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিন-তলাপাত্র এবার ফাঁপড়ে পড়লো।

ছোট মুখ বাড়িয়ে বড়র কাণে-কাণে কি যেন বললে।

বড় আবার সেই কথাটা দারোগাবাবুকে জানিয়ে দিলে। বললে—লিখুন—তার রাগের কারণ, আমাদের বাড়ীর কাছেই এক ব্যাটা ডাক্তার থাকে—কি নাম?

ছোট বলে দিলে—কমলাক্ষ!

হুঁ। বলে দারোগাবাবু পেন্সিলটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললে—তাহলে এই কমলাক্ষ লোকটাকে তো ধরতে হয়।

বড় আনন্দে একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠলো। বললে, চলুন—এক্ষুনি চলুন। আমাদের গাড়ী রয়েছে সঙ্গে।

দারোগাবাবুর হাতে কোনও কাজ ছিল না। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—চলুন।

মেজ বললে—একজন কনষ্টেবল আর হাতকড়াটা-নিন সঙ্গে।

দারোগাবাবু বললেন—না থাক, আইনে বাধবে। চলুন আমি নিজেই যাই তাহলেই হবে।

দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তারা আবার গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

ছোট বললে—আচ্ছা করে ধমক দেবেন স্যার, বলবেন, তোমাকে আমি জেলে পুরে দেবো। বুঝলেন? মাণনা বিয়ের ব্যাপারটা ব্যাটা একেবারে ভেস্তে দিলে।

দারোগাবাবু মনে মনে আবার একটুখানি হাসলেন। বললেন—বিয়ের ব্যাপার? বলেন কি ছোটবাবু? ওরই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন ভেবেছিলেন নাকি?

মেজ বললে—না না, ওর সঙ্গে কেন আমরা মেয়ের বিয়ে দিতে যাব? আমরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি আনন্দ তালুকদারের সঙ্গে। নাম শোনেননি অনিন্দ্য তালুকদারের?

দারোগাবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন—নাঃ!

ছোট বললে—বাঃ খবরের কাগজে নাম ছাপা হয়েছিল, ছবি ছাপা হয়েছিল বিলেত থেকে ফেরবার আগে।

দারোগাবাবু বললে—আজকাল ওরকম অনেক ছাপা হয়। নজরে পড়েনি।

বড় বললে—অনেক ছাপা হয়, বলেন কি দারোগাবাবু? কই, ছাপান দেখি আপনার চেহারাটা? আমি সেদিন বাগবাজার বালিকা

বিদ্যালয়ের মিটিংএ প্রেসিডেন্ট হয়েছিলাম। ছবিটা ছাপবার জন্যে এরা সব এত চেষ্টা করলে, কাগজওয়ালারা কিছুতেই ছাপলে না।

ছোট বললে—গাড়ীটা ফানুস লেন দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চল হে ড্রাইভার।

অর্থাৎ এই দিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিলে কমলাক্ষর ডাক্তারখানাটা পাশেই পড়বে।

গাড়ী চললো ফানুস লেন দিয়ে ঘুরে। কথা তাদের হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। পাশেই কমলাক্ষর ডাক্তারখানায় আলো জ্বলছে। ছোট বললে—দাঁড়াও।

গাড়ী দাঁড়ালো একটুখানি আগেই।

ছোট বললে—তোমরা বোসো গাড়ীতে। আমি আগে দেখে আসি—বাটা আছে কি না। তারপর দারোগাবাবুকে নিয়ে গিয়ে একেবারে ক্যাঁক ক'রে—

কথাটা শেষ না করেই আনন্দে সে হেসে উঠলো।

তারপর পা টিপে টিপে ঢুকলো গিয়ে কমলাক্ষর ডাক্তারখানায়।

কিন্তু এ কি! তার যেন গলার আওয়াজ শুনে দোরের আড়ালে থমকে দাঁড়ালো। গলার আওয়াজ মণিমালার।

ভেতরে তখন কথাবার্তা চলছে মণিমালার সঙ্গে কমলাক্ষর।

মণিমালা বলছে—হ্যাঁ, এজন্যে আপনি দায়ী।

কমলাক্ষ কি যেন জবাব দিলে সেকথা শোনার জন্যে ছোট আর সেখানে দাঁড়াতে পারলে না। একজন চাকর বোধকরি সেইদিকেই আসছিল।

ছোট তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে এসে গাড়ীর দরজাটা খুলেই চড়ে পড়লো গাড়ীর ভেতরে। ড্রাইভারকে বললে—চল—বাড়ী চল!

বড় জিজ্ঞাসা করলে—কি হ'লো?

ছোট বললে—চল বলছি গিয়ে। এখানে বলব না।

বাড়ী ফিরে এসে দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তারা বাইরের ঘরে বসলো। চাকরকে বললে—তামাক দে। দারোগাবাবুর জন্যে চা আর জলখাবার নিয়ে আয়।

চাকরটা চলে যেতেই বড় বললে ছোটকে—বল কি বলবো বললি।

ছোট তৎক্ষণাৎ বড়র কাণের কাছে মুখ নিয়ে গেল চুপি চুপি বললে—মণিমালার সন্ধান পেয়েছি। কমলাক্ষের সঙ্গে বসে গল্প করছে।

বড় প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেল। তারপর বললে—একথা চুপি চুপি বলবার কি দরকার? দারোগাবাবু ডায়েরীটা আপনি আর লিখবেন না। শেষে কমলাক্ষর সঙ্গেই মেয়ের বিয়েটা বোধহয় দিতে হলো।

মেজ বললে—ভালই হ'লো, খরচ কম পড়বে।

বড় তাকে এক ধমক দিলে। বললে—তুই থাম। তুই শুধু খরচই দেখছিস।

ছোট বললে—থাকগে দাদা, আর ভেবে লাভ নেই। মেয়ের যেখানে খুশী সেখানেই বিয়ে করুক। মেয়ে বড় হয়েছে।

বড় বললে—সেই ভালো। মিছিমিছি দারোগাবাবুকে কষ্ট দিলাম।

দারোগাবাবু বললেন—কষ্ট আর কি? কাজ না থাকলে এমনই তো আপনাদের বাড়ী আড্ডা মারতে আসি। মেয়ের বিয়ে নিয়ে কি ব্যাপার হ'লো বলুন তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বড় বললে—আমরাই কি ছাই বুঝতে পারছি কিছু। ঝকমারি হয়েছে দাদা মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে। এ-সব আমাদের চোদ্দপুরুষে কখনও ছিল না।

দারোগাবাবু হাসলেন। হেসে যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তার জন্যে চা এলো, জল খাবার এলো, প্রকাণ্ড গড়গড়ায় তামাক এলো।

কাজেই কথা গেল বন্ধ হয়ে।

ছোট বললে—বিয়ের কার্ডটা কোথায় রাখলে দাদা?

কেন? কার্ড কি হবে?

ছোট বললে—আবার নতুন করে তৈরি করি।

মেজ বললে—কমলাক্ষের বাপ-মার কাছে যেতে হবে না ?

তাও তো বটে ? মেজ'র বুদ্ধি আছে।

দারোগাবাবু হাসি চাপতে পারলেন না।

বড় জিজ্ঞাসা করলে হাসছেন যে দারোগাবাবু ?

দারোগাবাবু বললেন—হাতকড়া আনলে তো আমি ভারী বিপদে পড়তাম।

বড় বললে—আর বলেন কেন স্যার ! ভারী ঝকমারিতে পড়ে গেছি।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল একটি মেয়ে তাদের সুমুখের দরজা পেরিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর নজর পড়লো বড় তলাপাত্রেরই প্রথম। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ডাকলে —মণি।

কিন্তু মেয়েটি পিছন ফিরতেই দেখা গেল মণিমালা নয়।

মেয়েটি বললে—আমি মণি নই, মীরা। আমাকে চিনতে পারছেন না ?

ছোট চুপি চুপি বললে—একেই না ডাণ্ডি হোটেলে দেখলাম দাদা।

তার সে চুপি চুপি বলা মীরা শুনতে পেলে। বললে—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমিও তো আপনাদের দেখলাম। আমি অনিন্দ্যবাবুর বোন—মীরা। মণিমালার সঙ্গে কলেজে পড়বার সময় কতদিন আপনাদের বাড়ী এসেছি, ভুলে গেছেন ?

বড় বললে—ও হ্যাঁ।

ছোট বললে—হ্যাঁ ঠিক।

মীরা বললে—দাদা ফিরেছে শুনে আমি আসানসোল থেকে এলাম।

বড় বললে—হুঁ। আসানসোলে বুঝি তোমার বিয়ে হয়েছে ?

মীরা লজ্জায় মাথা হেঁট করে বললে—না, বিয়ে আমি করিনি।

সেখানকার গার্লস স্কুলের আমি টিচার।

এই বলে সে একবার দোতালার দিকে তাকিয়ে ডাকলে—মণি! —বলেই সে সিঁড়ি দিয়ে আবার ওপরে উঠে যাচ্ছিল, বড় বললে—মণি বাড়ীতে নেই।

মীরা বললে— নেই! কোথায় গেছে.

ছোট বললে- এসো দেখিয়ে দিই।

এই বলে সে মীরাকে সঙ্গে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল. দোরের কাছে গিয়ে বললে— সঙ্গে লোক দেবো, না। একাই যেতে পারবে? ওই যে দেখছো রাস্তার পাশে মস্ত বড় সাইন বোর্ড দেওয়া ডাক্তারখানা মণি ওইখানে রয়েছে দেখে এলাম।

মীরা জিজ্ঞাসা করলে—ডাক্তারখানায় কেন?

ছোট বললে সে আর তোমাকে—

এই পর্যন্ত বলে কথাটা সে আর শেষ করতে পারলে না। বললে, তাকেই জিজ্ঞাসা কোরো।

মীরা চলে যাচ্ছে, আবার তাকে সে ফিরে ডাকলে। বললে ওখান থেকে মণি যেন আর-কোথাও চলে না যায়, তুমি তাকে জোর করে বাড়ীতে ফিরিয়ে এনো। বুঝলে?

মীরা বললে, আনবো।

বলেই চলে গেল।

কমলাক্ষর ডাক্তারখানায় তখনও ঠিক তেমনি আলো জ্বলছিল। সদর দরজাটা পার হয়ে গিয়ে মীরা একবার থমকে দাঁড়ালো। চেম্বারের সুইংডোরের পাশে দাঁড়িয়ে ঢুকবে কি না ভাবছে, এমন সময় মণিমালার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বললে, বলুন! চুপ করে রইলেন যে? জবাব দিন?

পুরুষ কণ্ঠে জবাব এলো, আমার সেই এক কথা। যা বলবার তা আমি আগেই বলেছি।

এই বলে সে হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে, দেখুন তো। আপনারা দু জনে করলেন ঝগড়া। আমাকে এর মধ্যে টানছেন কেন? আমি গরীব বেচারা, দূরে পড়ে আছি, আপনারা বড়লোক, আপনাদের [illegible] কত হবে, কত যাবে। তার ওপর আপনি হলেন গিয়ে [illegible] শিক্ষিতা, এই [illegible] ব্যাপারে আপনার এরকম ভয় তো ভাল নয়

কথাগুলো মীরার মনে অসম্ভব [illegible] কৌতূহল জাগিয়ে দিলে। কিন্তু এর [illegible] মণিমালা যা বললে, তার পর আর শোনবার আশা করা বৃথা। মণিমালা বোধহয় উঠে দাঁড়ালো। বললে, বেশ, তাহলে আজ আমি চলুন। যাবার সময় এইটুকুই জানিয়ে গেলুম যে আপনি [illegible]—

কথাটা কমলাক্ষ শেষ করে দিলে। বললে, খারাপ মানুষ। এই তো? বলেই সে আবার হো-হো করে হেসে উঠলো।

মীরা এইবার বললে, আসতে পারি?

কমলাক্ষর হাসি সহসা বন্ধ হয়ে গেল। বললে, কে? আসুন। বলেই মণিমালার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি আবার তেমনি লুকোতে পারেন।

মণিমালা কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো মীরা।

কমলাক্ষ তো তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলই, মণিমালাও কম বিস্মিত হলো না। বললে, মীরা। তুই।

মীরা বললে হ্যাঁ, আমি। তারপর হাত জোড় করে একটি নমস্কার করে বললে, নমস্কার। কিছু মনে করবেন না যেন, আমি আপনাদের আলোচনায় বাধা দিলাম।

কমলাক্ষ নমস্কার করে বললে, মনে করবার কিছু নেই। আপনি বাধা দেবার আগেই আলোচনা আমাদের শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

মণিমালা বললে, অনিন্দ্যবাবুর বোন—মীরা। আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম।

মীরা বললে, আলোচনা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন আর বসলাম কেন? উঠি।

এই বলে সে বোধহয় উঠতেই যাচ্ছিল, কমলাক্ষ বললে, কেন? জায়গাটা খারাপ মনে হচ্ছে, না জায়গার মালিককে খারাপ মনে হচ্ছে?

এ-কথা বলবার পর ওঠা চলে না—অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে।

মীরা কমলাক্ষর মুখের পানে তাকিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হেসে বললে—আপনি তো বেশ লোক।

কমলাক্ষ বলল—এটা নিন্দে না প্রশংসা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখখানি ফিরিয়ে মীরা আবার একটুখানি হাসলে।

কমলাক্ষর এত ভাল লাগলো যে সেদিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারলে না।

মীরাও তার মুখের পানে তাকিয়েছিল।

হঠাৎ তার আয়ত চোখ দুটি একটুখানি নামিয়ে টেবিলের ওপর কাঁচের পেপার ওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললে—যার সঙ্গে এখনও আমার ভাল করে পরিচয় হলো না, হঠাৎ তার নিন্দে করে বসবো—এতখানি অভদ্রই বা আপনি আমাকে ঠাওরালেন কেন বলুন?

কমলাক্ষ হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে—পরিচয়? পরিচয়ের কথা আর বলবেন না। আপনার বন্ধু মণিমালাকেই জিজ্ঞাসা করুন। ওঁর সঙ্গে আমার ক'দিনেরই বা পরিচয়। অথচ

আজ উনি নিজে বাড়ী বয়ে এসেছেন আমাকে অভদ্র বলে গালাগালি দিতে! সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করুন! বন্ধু তো সুমুখেই বসে রয়েছে!

মীরার মুখের হাসি তখনও মুখেই লেগে রয়েছে। হাসতে হাসতেই সে তাকাল মণিমালার দিকে।

মণিমালা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চল মীরা, ওঠ! ওর সঙ্গে কথায় তুই পেরে উঠবি না।

এই বলে মীরার হাত ধরে টেনে তাকে সে তুলে দিলে। বললে, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। কবে এলি আসানসোল থেকে?

মীরা বলল—আজই।

বাধ্য হয়েই তাকে উঠতে হলো। হাত দুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে কমলাক্ষকে একটি নমস্কার করে বললে—আসি।

কমলাক্ষও নমস্কার করে বললে—উনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে যাচ্ছেন, আড়ালে হয়তো আমার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলবেন, কিন্তু আপনি যেন দয়া করে সেসব কথা বিশ্বাস করবেন না।

মণিমালা বললে—আমি যা কিছু বলি সামনে বলি, আড়ালে বলি না।

এই বলে সে তার হাত ধরে জোর করে একরকম টেনেই তাকে দোরের দিকে দু'পা এগিয়ে নিয়ে গেল।

হঠাৎ টেবিলের ওপর নজর পড়তেই কমলাক্ষ দেখলে, নীল রঙের একখানা খাম পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে দেখলে, খামের ওপরে অনিন্দ্যের নাম ঠিকানা লেখা। হাতের লেখাটা কার? নিশ্চয়ই মণিমালার। মণিমালাই ফেলে গেল বোধহয় মনের ভুলে।

খামটা তখনো বন্ধ করা হয়নি। চিঠিখানা খুলে পড়বার জন্যে কমলাক্ষর মনের লোভ একেবারে প্রচণ্ড হয়ে উঠলো। কিন্তু খুলতে

গিয়ে হঠাৎ কোথায় যেন বাধলো। খুলতে পারলো না। চিঠিখানা উলটে-পালটে দেখে হাতের কাছেই নামিয়ে রাখলে।

কিন্তু মানুষের লোভ যে কখন কোন পথ দিয়ে যাওয়া আসা করে মানুষ সহজে তার হদিস পায় না। অনিন্দ্যের চিঠিখানা হাতের কাছে পড়ে রয়েছে। কমলাক্ষর মন বারংবার শুধু মীরার চিন্তাকে অতিক্রম করে সেই চিঠির দিকেই ছুটছিল। শেষে ধীরে ধীরে সেটা এমনি দুর্দমনীয় হয়ে উঠল যে আর কিছুতেই সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। খুলবো খুলবো না করেও চিঠিটা সে এক সময় খুলে বসলো। দেখলে—

মণিমালা লিখেছে—

তোমাকে চিনি বলে মনে আমার একটা অহঙ্কার ছিল, সে অহঙ্কার যে তুমি এমন করে এক নিমেষে ভেঙে ফেলবে তা আমি ভাবতেও পারিনি! নিজের মন দিয়েই তোমাকে চিরকাল আমি বিচার করে এসেছি। এখন দেখছি—নিতান্ত ভুল করেছি। বিলেত থেকে তুমি যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়েছ। তোমার ভালবাসায় উদারতা নেই। তোমার ভালবাসায় বিশ্বাস করে ঠকতে হয়।

তোমার খানসামা টেলিফোনে বলেছিল তুমি মেমসাহেব নিয়ে বেরিয়ে গেছ, মেমসাহেবটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

ভগবান রক্ষা করেছেন—তোমার সঙ্গে এখন আমি চিরদিনের জন্যে জড়িয়ে পড়িনি। তোমার ওই পলকা ভিতের ওপর ইমারত গড়তে ভয় করে।

কমলাক্ষবাবুর ডাক্তারখানায় আমি কেন পাঠিয়েছিলাম এবং কেনই বা তার প্রাইভেট চেম্বারে লুকিয়েছিলাম, আমি জানি তোমার মন তার কৈফিয়ৎ চাইবে। সেকথা তোমার বন্ধুর কাছেই শুনো। আমি শুধু এইটুকু অনুরোধ জানাতে পারি—এর জন্য বন্ধুকে ভুল বুঝো না! এতে তাঁর কোনও দোষ নেই। এই বোধহয় আমার শেষ চিঠি।

তোমার সঙ্গে দেখাশোনার এইখানেই শেষ করে দিতে পারলেই যেন ভাল হয়। ইতি—

চিঠিখানা পড়ে কমলাক্ষ মনে মনেই একটুখানি হাসলে। মণিমালার এখানে আসবার কারণ এতক্ষণে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

চিঠিখানা নিয়ে সে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করলে। তারপর কি যেন ভেবে আপন মনেই একটুখানি হেসে ডানদিকের ড্রয়ারটা টেনে ভেতরে সযত্নে চিঠিখানা রেখে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো ডাকলে — শ্রীপতি

শ্রীপতি তার বেয়ারার নাম। ডাক শুনেই সে দরজার কাছে এসে বললে, হুজুর।

কমলাক্ষ বললে—বন্ধ কর আমি চললুম।

মীরাকে সঙ্গে নিয়ে মণিমালা তাদের বাড়িতে ঢুকেই বাইরের ঘরে বোধহয় ঢুকতে যাচ্ছিল টেলিফোন করবার জন্য। হঠাৎ দারোগাবাবুকে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। ডাকলে—বাবা

ছোট তলাপাত্র এবং তার পিছু পিছু বড় ও মেজ তিনজনেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

মণিমালা বললে—অনিন্দ্যবাবুকে একটা টেলিফোন করে জানিয়ে দাও, মীরা আজ এইখানেই থাকবে।

বড় বললে—অনিন্দ্য তো নেই!

মীরা বললে—এতক্ষণে এসেছে।

আচ্ছা তাহলে টেলিফোন করি। এই বলে তারা তিনজনেই আবার ঢুকে পড়লো।

দারোগাবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন—আমি চললুম বড়বাবু।

মেজ বললে—যাবেন? আচ্ছা যান।

তার সঙ্গে এখন তাদের প্রয়োজন নাই। সুতরাং দারোগাবাবুর নমস্কারের জবাবে প্রতি-নমস্কার করবার প্রয়োজন মনে হলো না।

তিন তলাপাত্র টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মীরাকে সঙ্গে নিয়ে মণিমালা তার দোতলার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

মীরা বললে—রাতটা এখানেই থাকতে বলছিস মণিমালা, কিন্তু দাদার সঙ্গে আমার এখনও দেখাই হলো না। থাক—

বলে সে ইজিচেয়ারটার উপর গা এলিয়ে দিয়ে বললে—এইখানেই আসবে হয়ত।

মণিমালা আয়নার কাছে দাঁড়িয়েছিল। গায়ের জামাটা-খুলতে খুলতে বললে—না, এখানে আসবে না।

কেন বলত? ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে নাকি?

মণিমালা তার কাছে এসে বসলো। বললে—তোর কি মনে হয়।

মীরা মুখ টিপে হাসলে। বললে—দেখা হতে না হতেই ঝগড়া। তোর বাবাকে আর জ্যেঠামশাইকে হোটেলে দেখেই আমি ভেবেছিলাম—

কথাটা তার শেষ হলো না। মণিমালা বললে, ওরা আবার কখন গেলেন সেখানে? তোর দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মীরা বললে, না। একটা চিঠি নিয়ে খানসামার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন, আমি আসতেই চুপ হয়ে গেল। ওঁরা চলে এলেন।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করলে, কার চিঠি?

তোর।

আমার চিঠি?

মীরা বললে, হ্যাঁ, তোর। দাদা দিয়ে গিয়েছিল খানসামার হাতে ডাকে দেবার জন্যে।

মণিমালার আগ্রহ যেন বেড়ে গেল। বললে, তারপর? কি হলো সে চিঠি? ডাকে দিয়েছে?

মীরা বললে, না, আমি এনেছি।

মণিমালা বললে, এতক্ষণ বলতে হয়। কই, দেখি চিঠিখানা। বলেই তার হঠাৎ কি যেন মনে হলো। কি যেন হারিয়েছে এমনি ভাবে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলে। একবার উঠে গেল ড্রেসিং টেবিলের কাছে; একবার এলো খাটের পাশে, জামার ভেতর হাত চালিয়ে দেখলে সেখানেও নেই। কোথায় গেল তাহলে?

মীরা বললে কি?

মণিমালা বললে, খামের চিঠি একখানা।

কার চিঠি?

বলতে কেমন সঙ্কোচবোধ হচ্ছিল, তবু শেষ পর্যন্ত তাকে বলতেই হলো। বললে, লিখছিলাম তোর দাদাকে। যা, সে চিঠি হারালে তো চলবে না! কমলাক্ষবাবুর ডাক্তারখানায় ফেলে এলাম না তো?

মীরা বললে, ফেলেই যদি এসেছিস, তাতেই বা কি হয়েছে?

মণিমালা বললে, না। না খামটা বন্ধ করা হয়নি।

মীরা বললে, বেশ মেয়ে বাবা। ওখানে গিয়েছিলি কি জন্যে মরতে? চল যাই, নিয়ে আসি।

মীরা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই উঠে দাঁড়ালো।

মণিমালা তার মুখের পানে একবার তাকালে, মুখ টিপে একটু হেসে বললে, খুব যে আগ্রহ দেখছি। ওকে কি তোর ভালো লেগেছে নাকি?

মীরা বসে পড়লো। বললে, না, আমি যাব না। তুই যা।

কারও গিয়ে কাজ নেই। বলেই মণিমালা চিৎকার করে ডাকতে লাগলো, ভোলা। ভোলা।

ডাক শুনে একটা চাকর ছুটে এসে দাঁড়ালো।

মণিমালা বললে, যা তো ভোলা, কমলাক্ষবাবুর ডাক্তারখানায় গিয়ে বল দিদিমণি একখানি চিঠি ফেলে গেছে, দিন।

ভোলা তৎক্ষণাৎ ছুটলো চিঠি আনতে।

কিন্তু মীরা অকস্মাৎ একটুখানি গম্ভীর হয়ে গেছে।

মণিমালা সেটা লক্ষ্য করলে। বললে, দে এবার আমার চিঠিখানা দে, দেখি, কি লিখেছে।

হাতের ইসারায় মীরা তার হ্যাণ্ড ব্যাগটা দেখিয়ে দিলে। মুখে কোনও কথা বললে না।

অন্য সময় হলে মণিমালা হয়ত তার এই আকস্মিক গাম্ভীর্যের কৈফিয়েৎ তলব করে বসতো, কিন্তু এখন তার আর সে অবসর কোথায়। অনিন্দ্য চিঠি লিখেছে। সে চিঠি না পড়ে যেন স্বস্তি পেলে না। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে সে তৎক্ষণাৎ পড়ে ফেললে। অনিন্দ্য লিখেছে—

এরকম যে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মণিমালা। তুমি তোমার যাকে খুশী ভালবাসবে, যাকে খুশী বিয়ে করবে তার জন্যে দুঃখ নেই, দুঃখ শুধু এই জন্যে যে, তোমরা দু'জনেই—কমলাক্ষ এবং তুমি, আমাকে এ-কথাটা ঘূর্ণাক্ষরেও জানাওনি।

তুমি যখন আমাকে টেলিফোন করেছিলে, আমিও টেলিফোনের পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম এবং তোমার ওপর রাগ করেই খানসামাকে দিয়ে বলেছিলাম, বলে দাও মেমসাহেব নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তখন কি জানতাম, তুমিও কমলাক্ষের সঙ্গে প্রেমালাপে মত্ত।

এ নিয়ে আর বেশি দূর বাড়াবাড়ি করতে চাই না। তোমার বাবা জ্যেঠাদের আমি জানিয়ে দিয়েছি, মেয়ের বিয়ে কমলাক্ষের সঙ্গেই দিন।

বিয়ের দিন নিমন্ত্রণ কোরো। একান্তই যদি উপস্থিত থাকতে

না পারি, দু'জনের জন্যে অন্ততঃ দুটো হাতঘড়ি উপহার পাঠিয়ে দেবো। ইতি—

চিঠিখানা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলে মণিমালা মীরার দিকে একবার তাকালে মীরাও তখন তারই মুখের পানে চুপ করে তাকিয়ে আছে জিজ্ঞাসা করলে, কি লিখছে রে। তোর মুখখানা হঠাৎ ও-রকম হয়ে গেল কেন?

মণিমালা তার কোলের উপর চিঠিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

মীরা আদ্যোপান্ত পড়লে চিঠিখানা।— একবার দুবার।

তারপর মুখ তুলে চাইতেই দেখে, বিছানার ওপর উপুর হয়ে শুয়ে মণিমালা বোধহয় কাঁদছে।

মীরা একটুখানি অবাক হয়ে গেল তবে কি মণিমালাও কমলাক্ষকে ভালবাসে।

এমন সময় ভোলা চাকরটা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

মীরা তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে গেল। মণিমালাকে যাতে সে দেখতে না পায় এমনিভাবে দরজাটা আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কই, দে চিঠিখানা।

ভোলা বললে—ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কাউকে পেলাম না।

আচ্ছা যা বলে তাকে বিদায় করে মণিমালার পাশে এসে বসলো। গায়ে হাত দিয়ে বললে—শুনলি ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

মণিমালা ধীরে ধীরে উঠে বসলো। বললে—শুনলাম।

মীরা বললে—তুই কি সত্যিসত্যিই কমলাক্ষবাবুকে—

মণিমালা চীৎকার করে উঠলো—না—না—না।

তবে এ-সব কি কাণ্ড! দাদা এ রকম চিঠি লিখলে কেন?

মণিমালা উঠে দাঁড়ালো। বলল, তোর দাদাই জানে।

মীরা বিশ্বাস করলে না। বললে, না। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। এ-সব ব্যাপারে আমার কাছে লজ্জা করিসনি মণি, বল কি হয়েছে।

বলবার কিছু নেই। বলে মণিমালা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মীরাও গেল তার পিছু পিছু। বললে, এই ভালবাসাবাসির ব্যাপারে নিজের কাছে লুকোচুরি খেলিসনি! সারাজীবন পস্তাতে হবে। আমাকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়, আমি বেশ ভালো করে জানি।

মণিমালা বললে, আমিও জানি। তোর দাদাকে বলিস—বিয়ে আমি করব না আর যদি করতেই হয় তো ওই কমলাক্ষ ডাক্তারকেই করব।

কথাটা রাগের কথা কি না মীরা ঠিক বুঝতে পারল না। কথাটা তারও বুকে এসে কেমন যেন ধক্ করে বাজলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি যেন ভাবছিল মণিমালা। বললে, কমলাক্ষবাবু ঠিকই বলেছিলেন।

এতক্ষণ পরে মীরার যেন হুঁশ হলো। মণিমালার দিকে তাকিয়ে বললে, কি বলছিলেন?

মণিমালা বললে, বলছিলেন—এতদিনের জানাজানির পরেও যে ভালবাসার এত সন্দেহ, সে-ভালবাসার কোনও দাম নেই।

মীরা বললে, কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?

মণিমালা বললে, দিন পনোরোর বেশী নয়।

মাত্র পনেরো দিন!

আশ্চর্য হবার কি আছে? অনেকের তো শুনেছি প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়। লাভ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট। আবার কারও কারও বা পনেরো দিন কেন, পনেরো মিনিটই যথেষ্ট।

মীরা বললে, তার মানে?

মণিমালা বললে, মানে কিছুই নয়। তোর সঙ্গে কমলাক্ষবাবুর কতক্ষণের পরিচয়? পনেরো মিনিট! বোধহয় তার চেয়ে কম।

মীরা বললে, তাহলে বলতে—কি চাস—আমি তোর ওই কমলাক্ষ-ডাক্তারের প্রেমে পড়ে গেলাম ?

এই বলে সে নিজেই যেন জোর করে টেনে টেনে হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে বললে, নাঃ, তুই যখন ওকে বিয়ে করবি বলছিস, আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। তোর সঙ্গে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে লাভ নেই।

মণিমালা বললে, কেন, লাভ নেই কেন ?

মীরা বললে, না পারব না।

কেন ?

তুই আমার চেয়ে সুন্দরী।

কথাটা এবার বোধ হয় প্রেমের চেয়েও বড় ব্যাপারে এসে গেল।

মণিমালা বললে, যাঃ।

মীরা বললে, ছাখ না আরশিতে নিজের মুখখানা একবার।

এই বলে সে তার আগেই একবার নিজের মুখখানা চট করে দেখে নিলে।

দেখতে দেখতে নিজেদের রূপ-যৌবনের কাথায় তারা এমনি মেতে উঠলো যে তার তলায় কোথায় চাপা পড়লো তাদের প্রেম আর কোথায় ভেসে গেল অনিন্দ্য-কমলাক্ষ।

পরদিন সকালে উঠে মীর চলে গেল তার দাদার কাছে হোটেলে।

ডাণ্ডি হোটেলে পৌঁছে লিফট দিয়ে উঠে মীরা সোজা তার দাদার কামরায় ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। গলির মত সরু যে পথটা পার হয়ে দাদার ঘরে ঢুকতে হয়, তার একপাশে বসবার ঘরে পর্দাটা সরানো, আর সেই পর্দার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে, একদিকের সোফায় কাৎ হয়ে বসে সিগারেট টানছে তার দাদা, আর এক দিকের চেয়ারে বসে আছেন কমলাক্ষ ডাক্তার। কমলাক্ষবাবুকে সে যে এসময়ে এখানে দেখবে মীরা তা ভাবতেও পারেনি।

মীরা একবার ভাবলে—কাজ নেই এখন দেখা দিয়ে। একবার এক পা এগিয়েও গেল, আবার পিছিয়ে এলো। দেখা করবার লোভ সে বোধহয় সম্বরণ করতে পারলে না।

দরজার পর্দা সরিয়ে মীরা ঘরে ঢুকেই ডাকলে দাদা।

দাদা ছিল পিছন ফিরে। মুখ ফিরিয়ে বললে—মীরা। চল আসছি।

কিন্তু কমলাক্ষ দিলে সব গোলেমাল বাধিয়ে। বললে নমস্কার। চিনতে পারছেন।

মীরা বললে—কেন পারব না? আমার চোখে তো চশমা নেই। আপনি এখানে?

অনিন্দ্য মীরার দিকে তাকিয়ে বললে—তুই চিনিস নাকি কমলাক্ষকে? কমলাক্ষ. কই তুমি তো আমাকে সে কথা বললে না?

কমলাক্ষ বললে—যে কথা বলতে এসেছি আগে তার মীমাংসা হোক। আর ওঁর সঙ্গে তো মাত্র কয়েক মিনিটের চোখের দেখা। এমন কিছু ঘটনা নয় যা তোমাকে বলতেই হবে। না কি বলেন মীরা দেবী?

অনিন্দ্য বললে—ওকে আপনি অপনি কন করছ কমলাক্ষ, ও যে আমার ছোট বোন।

কমলাক্ষ বললে—তা বেশ, এবার থেকে তুমিই বলবো, কিন্তু ছোটই হোক, বড়ই হোক, মেয়ে জাতটাকে আমি বড় ভয় করি কিন্তু ভয়ের চোটে মুখ থেকে আপনা আপনিই বেরিয়ে যায়।

মীরা বললে, ভয় করেন?

কমলাক্ষ বললে, বাবাঃ। ভয় আবার করি না! এই ছাখো না, বন্ধুটি তোমার আমাকে কিরকম হিমসিম খাইয়ে দিলে। কাল রাত্রি এগারোটার সময় একবার এসেছি তোমার দাদার কাছে, আজ আবার সকালেই এসেছি।

কথাটা শোনবামাত্র মীরা একবার ফিক করে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

হাসিটা কমলাক্ষর চোখ এড়ালো না। তাছাড়া এমন সুন্দর মুখের হাসি জীবনে বোধহয় সে এই প্রথম দেখলে। এই রকম হাসিকে কবিরা বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মীরার মুখের পানে তাকিয়ে কমলাক্ষ বললে, তুমি হাসছো ?

মীরা সে কথার জবাব না দিয়ে অনিন্দ্যর দিকে তাকিয়ে বললে, কেন দাদা তুমি এই নিরীহ ভদ্রলোককে এত কষ্ট দিচ্ছ ? ওঁকে ছুটি দাও, উনি বাড়ী যান।

এই বলে মীরা কেন জানি না, তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিচিত্র এই মেয়েদের কাণ্ডকারখানা। কমলাক্ষ হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। মেয়েটা কেনই বা এলো, কেনই বা ছুটে পালিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলে না।

অনিন্দ্য বললে, দাঁড়াও আমি আসছি।

এই বলে সেও উঠে দাঁড়ালো।

কমলাক্ষ বললে, আমার কথা তো শুনেছ, এইবার তোমার বোনকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি নিশ্চয়ই ওকে সব কথা বলেছেন।

অনিন্দ্য চলে গেল। একা বসে রইলো কমলাক্ষ।

ঘরে ঢুকেই অনিন্দ্য ডাকলে ; মীরা।

আসছি ! বলে মীরা বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে।

এরই মধ্যে সে কাপড় জামা বদলেছে।

অনিন্দ্য জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার চিঠিখানা কাল তুই নিয়ে গিয়েছিলি ?

মীরা বললে. হ্যাঁ।

জবাব তো তুমি চাওনি।

অনিন্দ্য একটুখানি চুপ করে রইল। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলে, তোর সুমুখেই চিঠিখানা পড়লে ?

মীরা বললে, হ্যাঁ।

কি বললে ?

মীরা বললে—তাই বা তোমার জানবার দরকার কি দাদা ?

বলেই সে একবার হেসে হাসিটা লুকিয়ে বসলো গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে। বসেই বললে—তুমি তো সোজা জবাব দিয়ে বসেছ। লিখেছ, বিয়ে তুমি করবে না।

অনিন্দ্য বোধহয় একটুখানি লজ্জিত হলো। বললে—তুইও পড়েছিস নাকি চিঠিখানা ?

মীরা বললে—বয়ে গেছে।

অনিন্দ্য কিন্তু কিছুতেই ছাড়লেন না। বললে—পড়ে কি বললে বল না ?

মীরা বললে—বেশ আমি কমলাক্ষবাবুকেই বিয়ে করবো।

অনিন্দ্যর মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল।

মীরা এতক্ষণ পরে হো-হো করে হেসে উঠলো।

অনিন্দ্য বললে—হাসছিস যে।

মীরা বললে—আচ্ছা দাদা বিলেতে তুমি ওই মেমগুলোর সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা করেছ না ?

অনিন্দ্য বললে—কেন বল তো ?

মীরা বললে—নিজের উপর কেমন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ। তোমাদের দু'জনের মাঝখানে আবার কমলাক্ষবাবুকে টানলে কেন ?

অনিন্দ্য বললে—আমি তো টানিনি হঠাৎ দেখলাম আমার দেওয়া হাতঘড়িটা মণিমালা কমলাক্ষকে দিয়ে দিয়েছে। এতে রাগ হয় কিনা তুই-ই বল না ?

মীরা বললে—এইতেই তোমার এত রাগ হয়ে গেল দাদা ? তোমার জিনিষের ওপর তার কোন অধিকার নেই। তার জন্যে তুমি তাকে বলে দিলে, মেমসাহেবের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে ?

অনিন্দ্য বললে—আর এই কথা শুনে সেও চলে গেল কমলাক্ষর-

কাছে! আমার চোখের সুমুখে বেরিয়ে এলো কমলাক্ষর প্রাইভেট চেম্বার থেকে।

মীরা বললে—কিন্তু কেন সে কমলাক্ষবাবুর কাছে গিয়েছিল, কেন সে তার প্রাইভেট চেম্বারে গিয়ে লুকিয়েছিল, তোমার বন্ধু কমলাক্ষবাবু সে কথা তোমাকে বলেননি?

অনিন্দ্য বললে—'হ্যাঁ সেই কথা বলবার জন্যেই সে এসেছে। কাল আমি ওর ওপর রাগ করেছিলাম, ওর কোন কথাই শুনতে চাইনি, কিন্তু তুইও বলছিস, ওর কথাই সত্যি।'

মীরা এবার বোধহয় সত্যিই রাগ করলে। বললে—সত্যি মিথ্যে জানিনে দাদা। মণিমালার ওপর তোমার যদি এটুকু বিশ্বাস না থাকে তো বিয়ে তুমি ওকে করো না। যাকে ভালবাস তার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকলে চিরজীবন কষ্ট পাবে। বিয়ে করবার আগে বেশ ভাল করে বুঝে ছাখো সত্যিই তুমি মণিমালাকে ভালোবাসা কি না।' সেখানে যদি কোনও সন্দেহ থাকে তো ও-বেচারাকে কষ্ট দিও না।

এই বলে মীরা উঠে দাঁড়ালো।

অনিন্দ্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—'তাহলে মণিমালার জ্যেঠামশাইকে টেলিফোন করে দিই, বিয়ের ব্যবস্থা করুক, না কি বল?'

মীরা বলল—'সেকথা তুমি ভাল জানো। আমি কি বলব?'

টেলিফোন ছিল তার খাটের পাশে। অনিন্দ্য সেইদিকে এগিয়ে গেল।

মীরা বলে—'মণিমালার কাছে ক্ষমা চেয়ো।'

বলেই সে একবার হাসল। হেসে বললে—'বেচারা কাল তোমার চিঠি পেয়ে কেঁদেই অস্থির!'

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলতে গিয়ে অনিন্দ্য থমকে দাঁড়ালো। বললে—'কি বললি? কাঁদছিল?

মীরা বললে, 'হ্যাঁ। সে তোমাকে সত্যিই ভালবাসে। তুমি টেলিফোন কর, আমি ততক্ষণ তোমার বন্ধুকে দেখি। অনেকক্ষণ একা চুপ করে বসে আছেন।'

মীরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরের ঘরের পর্দা সরিয়ে মীরা ঘরে ঢুকেই দেখলে, কমলাক্ষ একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁ করে ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছে।

মীরা হাসতে হাসতে বললে— কি করছেন ?'

কমলাক্ষ বললে, 'কিছু না। এই ধোঁয়া দেখছি '

মীরা বললে—'ধোঁয়া আর দেখতে হবে না। দাদা বললে 'আপনি বিয়ে করুন মণিমালাকে। সব ঠিক হয়ে গেল '

কমলাক্ষ যেন চমকে উঠলো! বললে—'বলেন কি ?'

মীরা বসলো সোফার ওপর! বললে—'আবার আপনি বললেন ?'

কমলাক্ষ বললে—'আপনি তুমি একই কথা। ভুলে বলে ফেলেছি। কিন্তু এ তুমি কি বলছ মীরা ? তোমার দাদা শেষ পর্যন্ত এই কথা বললে ?'

মীরা বললে—'তাতে হয়েছে কি ? এ ভয় পাচ্ছেন কেন ? আপনি মণিমালাকে ভালবাসেন ?'

'আমি ভালবাসি মণিমালাকে !'

'বাসেন না ?'

'বোধ হয় না।'

মীরা তার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হেসে বললে—'ভালবাসা কাকে বলে জানেন তো ?'

কমলাক্ষ বললে- 'কেমন করে জানবো বল, কেউ তো আর ভালোবাসেনি !'

মীরা বললে—'আপনিও কাউকে ভালবাসেননি ?'

কমলাক্ষ বললে—'ভাল অমনি বাসলেই হলো যাকে তাকে ? আগে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করতো বটে, তারপর দেখলাম, ও-সব কিছু না। ভালবাসা না পেলে ভালবাসা যায় না।'

মীরা বললে—'আবার তার উল্টো কথাও তো সত্যি ? ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না।'

কমলাক্ষ তার হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—'খুব সত্যি। তেমনি যোগাযোগের সন্ধানেই তো মানুষ বসে থাকে।'

মীরা বললে—'বসে আর থাকে কোথায় ? তার আগেই তো সব শেষ করে দেয়।'

মীরা ছিল হেঁটমুখে বসে। হঠাৎ মুখ তুলতেই দু'জনের চোখা-চোখি হয়ে গেল। মীরা একটুখানি হাসলে। সে হাসি যে কি, না দেখলে বোঝবার উপায় নেই। কমলাক্ষ তার বুকের ভেতর কেমন যেন একটা শিহরণ অনুভব করলে। মুখ দিয়ে তার আর কথা বেরুলো না। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে হাতটা তার কাঁপতে লাগলো।

দু'জনেই নীরবে বসে আছে। কেউ কারও মুখের পানে আর তাকাতে পারছে না। আশ্চর্য। কথা হচ্ছিল বাংলাদেশের জনসাধারণের। এর মধ্যে তার নিজেদের মনের খবর টের পেলে কেমন করে ?

আর বোধ হয় এমন চুপ করে বসে থাকা ভাল দেখায় না।

মীরা বললে—আপনার ডাক্তারখানা আজ তো এখনও খোলা হলো না। কিছু ক্ষতি হলো নিশ্চয়।

কমলাক্ষ ঈষৎ হেসে বললে—'ক্ষতি পূরণটাও হয়ে গেছে।'

মীরা হেসে উঠলো। বললে—মণিমালার সঙ্গে বিয়ের কথাটা শুনেই ?'

কমলাক্ষ বললে—'কি যে বলছো মীরা, পরিহাসটা নিদারুণ হয়ে যাচ্ছে। মণিমালাকে বিয়ে করবে তোমার দাদা। আর আমি বিয়ে করবো—

এমন কথাতেও যে বাধা পড়তে পারে, তা তাদের জানা ছিল না। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো অনিন্দ্য।

কথাটা বলতে হলো না বলে কমলাক্ষ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। কিন্তু মীরার হলো অস্বস্তি। দাদার কাছে প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে কি কথা সে বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ল মণিমালার চিঠির কথা। যদিও তার আর কোন প্রয়োজন নেই তবু সে কমলাক্ষকে প্রশ্ন করে বসলো—কাল ডাক্তারখানায় মণিমালা যে চিঠিখানা ফেলে এসেছিল, কি করলেন সে চিঠি?

কমলাক্ষ অনিন্দ্যর দিকে তাকিয়ে বললে—'যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছি।

অনিন্দ্য মীরাকে সরিয়ে সোফার পাশে এসে বসলো। বললে—দিলাম টেলিফোন করে। মীরা, তোকে আজ দুপুরে সেখানে যেতে হবে না। মণিমালাই খেয়েদেয়ে আসছে এখানে।

কমলাক্ষ ব্যাপারটা ঠিক তখনও বুঝতে পারেনি। হাঁ করে এদের মুখের পানে তাকিয়েছিল।

অনিন্দ্য বললে—তোমার আর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই কমলাক্ষ, এইখানেই এইবেলাটা স্নানাহার করে তারপর বিকেলে সবাই মিলে একসঙ্গে সিনেমায় যাব।

কমলাক্ষ বললে—হুঁ কিন্তু—

বলেই মীরার মুখের উপর চোখ পড়তেই দেখলে তার চোখে কেমন যেন একটা দুষ্টু হাসির চেহারা।

কমলাক্ষ ততক্ষণ রাস্তার দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। মীরা তখন তার পেছনে এসে দাঁড়ালো। বললে, রাস্তার শোভা দেখছেন।

হেসে কমলাক্ষ মুখ ফেরালে। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে মীরার দেখা পাবে তা সে ভাবেনি। বললে, না। ভাবছিলুম তোমার বন্ধু এলে কেমন ক'রে পালাব এখান থেকে।

দেখবেন যেন বারান্দা টপকে লাফিয়ে পালাবেন না। বলে হাসতে হাসতে মীরা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

কমলাক্ষ সেইদিকে তার একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলো প্রায় মিনিট-পনেরো। কিন্তু মীরা আর ফিরে এলো না। হঠাৎ দেখলে মীরার বদলে উড়ে খানসামাটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলে, আসুন।

কমলাক্ষ বললে কোথায়?

খামসামা বললে, নীচে গাড়ী এনেছি।

সর্বনাশ। মীরা তাহলে তাকে এমনি করে বিদায় করে দিতে চায় মনের অবস্থা তার অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। অনিন্দ্যের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া উচিত ছিল অন্তত। কিন্তু লিফ্‌টম্যান অপেক্ষা করবে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। খানসামার পিছু পিছু কমলাক্ষ লিফটে গিয়ে উঠলো

হোটেলের দরজার পাশে সত্যিই মোটর দাঁড়িয়ে আছে।

কমলাক্ষ গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দরজাটা খুলতেই দেখে রীতিমত সাজসজ্জা করে গাড়ীর ভেতর বসে আছে মীরা।

কমলাক্ষর মুখে এতক্ষণে হাঁসি ফুটলো।

মীরা বললে, আসুন চট করে। আপনি ঠিকই বলেছেন আমরা পালাই এখান থেকে।

কমলাক্ষ গাড়ীতে উঠে বসতেই মীরা মুখ বাড়িয়ে খানসামাকে বলে দিলে—দাদা জিজ্ঞেস করলে বলিস যেন—যা শিখিয়ে দিলাম—চল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

কমলাক্ষ জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছ?

মীরা বললে, যেখানে খুশী। মণিমালা আসবে—দু-জনের রাগ অভিমান হয়েছে, এসময় আমাদের ওখানে থাকা উচিত নয়, আপনি কি বলেন?

অনিন্দ্য বললে—কিন্তু মানে—তোমার ডাক্তারখানা। একদিন মাই বা খুললে।

কমলাক্ষ বললে—না তা হয় না। তবে কিনা, তোমাদের এই লাভ এ্যাফেয়ারসের মধ্যে আমাকে আর না টানলেই ভাল করতে।

মীরা বললে—আপনাকে তো কেউ টানেনি। আপনি নিজে ইচ্ছে করেই জড়িয়ে পড়েছেন।

কমলাক্ষ মীরার মুখের পানে তাকিয়ে একটুখানি তিরস্কারের সুরে বললে—তুমি থামো। তুমি আমাকে যা ভয় দেখিয়েছিলে।' জানো অনিন্দ্য, তোমার কাছ থেকে ফিরে ও আমাকে কি বলল জানো? বললে—মণিমালার সঙ্গে বিয়ে আপনার ঠিক হয়ে গেল দাদা বলল।

অনিন্দ্য হাসতে হাসতে মীরার মুখের দিকে তাকাতেই দেখলে, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে সে তখন ফিক্‌ফিক্ করে হাসছে

হাসতে হাসতে মীরা উঠে দাঁড়ালো। বললে- দাঁড়াও আবার দেখি। হোটেলের খাবার অতিথি একজন যখন জোটালে—

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অনিন্দ্য বলল—তা না হয় দেখবি। এখন তুই এক কাজ কর মীরা, চায়ের ব্যবস্থা কর।

ও মা। এত বেলায় চা খাবে!

কমলাক্ষ পানে তাকিয়ে দোরের কাছে মীরা ফিরে দাঁড়ালো!

অনিন্দ্য বলল—তা হোক।

কমলাক্ষ ঘাড় নাড়লে, কমলাক্ষর সম্মতি নিয়ে মীরা বেরিয়ে গেল।

* * *

এতক্ষণ যে কমলাক্ষ তাদের হোটেলে রইলো, এক খাবার সময় ছাড়া মীরার সঙ্গে তার দেখাই হলো না। খাবার সময় যদিও বা দেখা হলো, বিশেষ কোনও কথা হলো না।

খাবার পর মীরা একবার অনিন্দ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, মণি কটার সময় আসবে দাদা?

অনিন্দ্য বললে, ছুটোর সময়।

মীরা বললে, তা তো এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী।

এই বলে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি ভেবে থেমে গেল।

কমলাক্ষের তখন আর বোধহয় কথা বলবার শক্তি নেই শুধু সে তার মুখের পানে তাকিয়ে একটু হাসলে।

হাসছেন যে :

এমনিই।

মীরা বললে, হ্যাঁ, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আপনি তখন বলেছিলেন, মণিমালা বিয়ে করবে তোমার দাদাকে, আর আমি বিয়ে করব—এই পর্যন্ত বলতেই দাদা এসে গেল। আপনার কথাটা আর শেষ হলো না। আপনি কাকে বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন?

কমলাক্ষ বললে, আমি তো ঠিক করেছি, তার মত এখনও পাইনি।

কে সে?

একটি মেয়ে।

হ্যাঁ, আপনি পুরুষকে বিয়ে করবেন না আমি জানি। কিন্তু কে সে?

একান্তই শুনবে?

যদি কোন আপত্তি না থাকে।

কমলাক্ষ বললে ; তুমি।

মীরা চেঁচিয়ে উঠলো, ড্রাইভার! গাড়ী ফেরাও!

কমলাক্ষর বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো।

গাড়ীটা তখন মোড়ের মাথায়। আচমকা হুকুম পেয়ে ড্রাইভার একটু থতমত খেয়ে রীতিমত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ী দিলে বাঁদিকের রাস্তায় ঘুরিয়ে। মীরা বললে ঠিক আছে। চলো সিনেমায়।

বলেই সে কমলাক্ষর মুখের পানে এমনভাবে চাইলে, কমলাক্ষ না পারে কিছু বলতে, না পারে হাসতে। শুধু নীরবে একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বললে, ছাখো।

কি দেখব ?

এক্ষুনি হার্ট-ফেল করেছিলাম।

কিন্তু শুধু হাত দিয়ে মীরা ঠিক বুঝতে পারলে না। নিজের মাথাটা কমলাক্ষর বুকের ওপর রেখে কান পেতে শুনতে লাগলো।

কমলাক্ষ এতক্ষণ পরে হেসে তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, শুনতে পেয়েছ !

মীরাও হাসতে হাসতে বললে, পেয়েছি !

তারপর কি হলো আমরা কিছু জানি না।

* * *

ওদিকের হোটেলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঠিক যখন দু'টো বাজলো মণিমালার গাড়ী এসে দাঁড়ালো দরজায়।

টোকা মেরে ডাকলো—মীরা !

এসো !

মণিমালা ঘরে ঢুকলো। অনিন্দ্যর সঙ্গে চোখাচুখি হতেই সে একটুখানি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে। অভিমান হয়েছে বোধহয়। কথা কইবে না। অন্য দিকে তাকিয়ে ডাকলে—মীরা !

অনিন্দ্য বললে—খানসামা বলেছে মীরা গাড়ী করে বেরিয়ে গেল।

মণিমালার বোধহয় বিশ্বাস হলো না। আবার ডাকলে—মীরা। অনিন্দ্য বললে, আমার কথা বুঝি বিশ্বাস করলে না ?

না ! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। বলে সে সব ঘরগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলে, কোথাও তাকে দেখতে পেলে না। খানসামা বসেছিল বারান্দায়, জিজ্ঞাসা করলে—দিদিমণি কোথায় ?

খানসামা বললে—চলে গেল সেই বাবুর সঙ্গে।

কোন্ বাবু রে ?

বাবুর নাম জানি না, নতুন বাবু !

মণিমালা ঘরে ঢুকলো। কিন্তু এবার অনিন্দ্যর সঙ্গ কথা না বলে থাকে কেমন করে? বলল—কে এই নতুন বাবুটি?

অনিন্দ্য বললে—এবার বিশ্বাস হলো?

মণিমালা বললে—হলো। কিন্তু এই নতুন বাবুটি কে?

অনিন্দ্য বললে—কোথায় নতুন বাবু?

মণিমালা বললে—যার সঙ্গে তোমার বোন বেরিয়ে গেল?

পরিহাসটা অনিন্দ্য হজম করলে বোধহয়। বললে—কমলাক্ষ

মণিমালা এবার আর না হেসে থাকতে পারলে না। হাসতে হাসতে বললে—কে? কমলাক্ষ ডাক্তার? তার সঙ্গে চলে গেল? বল কি? মান-অভিমান তার কোথায় চলে গেল। হেসে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লে। বললে—একি তোমার কারসাজি, না সে নিজে থেকে—

অনিন্দ্য বললে—সত্যি বলছি, আমি কিছু জানি না।

তোমাকে বলেও যায়নি?

না। আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম শুনে।

বেশ হয়েছে আচ্ছা হয়েছে। আমাকে সন্দেহ করেছিলে যে বড়? এসো এইবার আমাদের বোঝাপড়া হোক।

এই বলে সে অনিন্দ্যকে নিজের কাছে টেনে এনে বসাল।

বোঝাপড়া একটা কিছু হলো নিশ্চয়ই।

নইলে বিবাহের দিন ঠিক যেদিন ধার্য হয়েছিল, সেই দিনই তলাপাত্র নিবাসের সদর দরজার সানাই বাজলো কেন?

খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা চুকলো, রাত্রি প্রায় বারোটায়। বিয়ে-বাড়ীর গোলমাল তখন একটু কমেছে। সিঁড়ি দিয়ে কমলাক্ষ নীচে নামছিল মীরার গলার আওয়াজ শুনে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো।

মীরা বললে—চলে যাচ্ছ যে, খেয়েছ?

এদের সম্বোধন এই প্রমথ শুনলাম, আপনি থেকে তুমি'তে এসেছে।

কমলাক্ষ বললে—খাব না। খিদে নেই।

খিদে নেই ? সারাদিন খেটে-খুটে খিদে কারও থাকে না। এসো, বলে নিজে গিয়ে কমলাক্ষকে টেনে আনলে, তারপর ভাঁড়ার ঘরের পাশের ঘরটায় গিয়ে আসন পেতে দিয়ে বললে—বসো।

নিজেই খাবার নিয়ে এলো, নিজে বসে বসে তাকে খাওয়ালে।

তারপর বললে—পালিও না। আমাকে নিয়ে যেতে হবে।

কমলাক্ষ বললে --কোথায় ?

আমদের বাড়ীতে।

কমলাক্ষ বললে, 'পারব না।'

মীরা বললে—বা রে ! আজ আমি এইখানে থাকব নাকি ?'

কমলাক্ষ বললে, হ্যাঁ। রাত্রে বাড়ী যান না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কমলাক্ষর কথার অবাধ্য আজকাল সে হয় না দেখছি। মীরাকে বাধ্য হয়েই থাকতে হলো।

কমলাক্ষ চলে যাচ্ছিল। মীরা বললে—'গায়ের কাপড় আননি বেশ তুমি। এই শীতে রাস্তা যাব হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ? দাঁড়াও।

কমলাক্ষকে সিঁড়ির নীচে দাঁড় করিয়ে মীরা তাড়াতাড়ি দামী একখানা শাল এনে কমলাক্ষের গায়ে জড়িয়ে দিলে।

বিয়ে বাড়ীর গোলমাল থামতেই তলাপাত্রদের হুকুমে সদর দরজায় খিল পড়েছিল। কমলাক্ষ দারোয়ানকে বললে—'খুলে দাও।'

দারোয়ান বললে—'হুকুম নেই।'

কমলাক্ষর ভয়ানক রাগ হলো। চীৎকার করে বললে—'হুকুম নিয়ে এসো।

বিয়ে চুকে গেছে, তাই মনের আনন্দে একই রকমের ফ্লানেলের তিননটে ফতুয়া গায়ে দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে তলাপাত্র তিন ভাই বৈঠকখানায় বসে তিনটে গড়গড়ায় তামাক টানছিল। চীৎকার শুনে একে একে তিনজনেই বেরিয়ে এলো। 'কে ?'

কমলাক্ষকে দেখেই বড় তলাপাত্র বললে— 'ও তুমি ? এত রাত্রির পর্যন্ত কি করছিলে হে ? দাও খুলে দাও।'

দারোয়ান দরজা খুলে দিল।

কমলাক্ষ বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার গায়ের শালখানার দিকে নজর পড়তেই বড় তলাপাত্র ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। বললে— 'দাঁড়াও তো দেখি! হুঁ, এ শালখানা কার ? কোথায় পেলে তুমি ?'

শালাখানা সে কোথায় পেল বলতে একটুখানি ইতস্তত করছিল। মেজ বললে—'দাদা ঠিক ধরেছে তো ? এ-শাল তো আমরাই সেদিন কিনলাম মণিমালার জন্যে।'

ছোটর আজ মেয়ের বিয়ে। কাজেই ছোঠ অতি কষ্টে চুপ করে রইলো।

বড বললে—'সাধে আমি দরজায় খিল বন্ধ করেছিলাম! আমি জানি যে, বিয়ে বাড়ীতে এমন সব কাণ্ড—

কমলাক্ষ বললে—'সেই ঘড়টার মত এটাও তাহলে আমি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি—কেমন ? এত বড় মানুষ হয়ে আপনার—কী ?'

বড় তলাপাত্রের অত্যন্ত রাগ হয়ে গেল কথাটা শুনে। কিন্তু সত্য মিথ্যা যাচাই না করে তো ছাড়া যায় না. মণি! মণি! মণিমালা! বলে চীৎকার করে সে একটা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলল।

দোতালার বারান্দায় মণিমালা বেরিয়ে এলো। মীরা বেরিয়ে এলো।

মীরা বললে—'মণি তোর জ্যেঠামশাইকে থামতে বল। শীতে উনি খালি গায়ে বাড়ী যাচ্ছিলেন, তোর শালটা ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছি।

'নিজেও জড়িয়েছো তো ওর সঙ্গে।'

বলেই, সে হাসতে হাসতে সেইখান থেকেই বললে, 'ছেড়ে দাও জ্যেঠামশাই শাল আমি দিয়েছি।'

এই ব'লে সে একেবারে ছুটতে ছুটতে অনন্দ্যির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সারদিনের কান্তির পর অনিন্দ্যর একটুখানি তন্দ্রা এসেছিল।

মণিমালা বললে শুনছে, ?

অনিন্দ্য বললে' 'কি ?'

মনিমালা বললে, 'তোমার বন্ধুটি আবার ধরা পড়েছে।'

অনিন্দ্য বোধ হয় একটু রহস্য করেই বললে, 'কার সঙ্গে ?'

মণিমালা তার কানে-কানে কি যেন ব'লে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লো।

অনিন্দ্য বললে, 'ডাকো ওদের।

মণিমালা বললে, আর পারি না। একেবারে বিয়ের দিন টিক করেই ডেকো।'

এই বলে সে বোধ করি মীরাকে শুনিয়ে শুনিয়েই হাসতে হাসতে দরজায় খিলটা সশব্দে বন্ধ করে দিলে।

নমস্কার